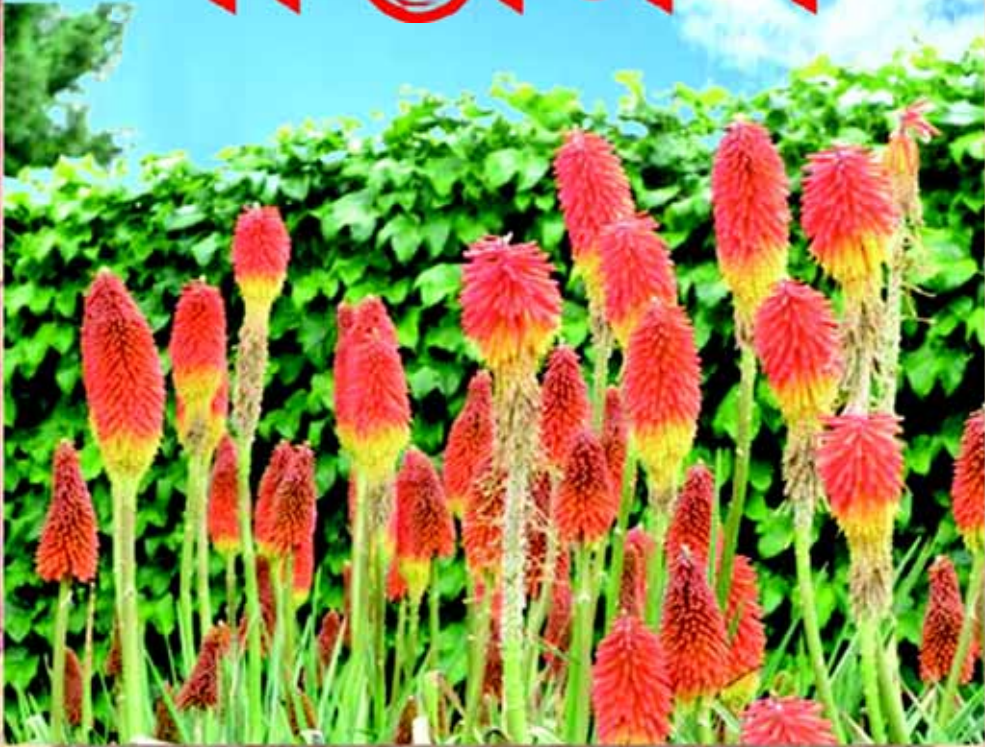


আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ

বাগায়ন



ডীসেম্বরে উৎসব



This art work is done with gel pen on black paper. It's a visualization of how thoughts pops in our head. This type of art is referred as 2 dimensional design it gives artist liberty to express their creativity following the rules of designing.

Lyra Mukherjee, IL, USA



বাগান

সম্পাদনা
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫



বাতায়ন

প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়, IL, USA

প্রচ্ছদশিল্পী

ঋতুপর্ণা চ্যাটার্জী, IL, USA

অর্ন্তপ্রচ্ছদ

লায়রা মুখার্জী, IL, USA

ব্যবস্থাপনা

বিশ্বজিৎ মতিলাল, Kolkata, India

অলংকরণ

কাজল ও সুরত, Kolkata, India

ফোটোগ্রাফার

তীর্থঙ্কর ব্যানার্জী, Perth, Australia

প্রকাশক

Neo Spectrum

ই-মেল : a_banerjee@iinet.net.au

রূপায়ন

অনুশ্রী ব্যানার্জী, Perth, Australia

বাতায়ন পত্রিকা বাতায়ন কমিটি দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। বাতায়ন কমিটির লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Published by the BATAYAN of Neo Spectrum, Perth, Australia. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editor is not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সূচীপত্র

ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য

টেকি স্বর্গে গেলেও	২
সুজয় দত্ত	
হোলি	৮
ধীমান চক্রবর্তী	
শতবর্ষের আলোকে — কলিকাতার ঐতিহ্যবাহী চোরবাগান চট্টোপাধ্যায় পরিবারের জগদ্ধাত্রী পূজা	৯
গানের মেলা - প্রাণের মেলা	১১
*উৎপলেন্দু চৌধুরী	
Celebration of Indianness in Minnesota	১২
Debarshi Roy	

দূর রেখাও

Oregon Travel Experience	১৩
Saumen Chattopadhyay	

ভাষাশাস্ত্র

‘নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা’ — অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়	১৫
মনামী গোস্বামী	

ভাষাশাস্ত্র

মেমসাহেবের দিন	১৬
দেবীপ্রিয়া রায়	
আমাদের বই পাঠে	১৯
বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়	
স্মৃতিচারণা — আমার দেখা রমা দাশগুপ্তা	২২
জয়ন্তী করঞ্জয়	
লিমেটিক	২৪
শুভ দত্ত	
A Game of Marbles	২৫
Bakul Banerjee	
Pens, Pencils and Binder Clips	২৫
Bakul Banerjee	
Chicago Poem	২৬
Binita Gupta	
Blue Moon	২৭
Bani Bhattacharyya	

FLASH OF THOUGHT

Calcutta Cuisine	২৮
Balarka Banerjee	

ভোজ্য কলা

Recipe	৩৩
Annyasha Mukherjee Roy	



Acknowledgement:

On behalf of Batayan magazine I want to thank all the contributors to our first issue. Thank you very much for being with us and trusting us. Thanks to everyone who provided us moral support. It is because of all our friends that the long cherished dream became a reality. We could not have done it without your support.

Ranjita Chattopadhyay



সঙ্গীত

‘ঝুমা, যা তো মা, বাইরের ঘরে তোর কাকা বসে আছেন, রসগোল্লার প্লেটটা দিয়ে আয়।’ ‘ও বুড়ীর মা, উপরের ঘরের বিছানার চাদরটা অবশ্যই বদলে দিও। চারটের মধ্যে তোমার ছোড়দা এসে পড়বেন কিন্তু।’ ‘দিদিভাই, দৌড়ে আগে উপরে যাও। তোমার দেওর আমার আর তোমার জন্য দুটো ঢাকাই শাড়ী নিয়ে এসেছেন — একটা হাল্কা বেগুনী রঙের আর একটা গোলাপী। দুটোই আমি আমাদের শোওয়ার ঘরের খাটের উপর বের করে রেখেছি। যেটা তোমার পছন্দ সেটা নিয়ে তোমার ঘরে রেখে এস — সন্ধ্যাবেলায় দুজনে পরে বেরোব।’ কান পাতলে আরও শোনা যাবে — নতুন গান, ঢাকের আওয়াজ, বাড়ীভরতি আত্মীয়স্বজনের কলরব। জিভে আসবে জল — এগ রোল, চিকেন রোল, মোগলাই আর বিরিয়ানীর গন্ধে। সাবেক আমলের লুচি, বেগুনভাজা, দরবেশের আবেদনও হারিয়ে যায় নি। খোলা জানালার বাইরে তাকানোর সময় আছে তো? দেখতে পাচ্ছেন একঝাঁক উজ্জ্বল প্রজাপতির মতো কিশোর কিশোরী সব কোথায় যেন চলেছে। কি মনে হয়? কোথায় যাচ্ছে তারা? ঠিক ধরেছেন। তারা আজ দল বেঁধে চলেছে উৎসবের সামিল হতে। কিসের উৎসব হে? উৎসবের কি হিসেব আছে কিছু? বাঙালী জীবনে উৎসব লেগেই আছে। পাল-পার্বণ, ধর্মীয় উৎসব, ব্যক্তিগত জীবনে নানাবিধ উদ্‌যাপন — উৎসবের সীমা সংখ্যা নেই কোন। তবে আসল কথা হল দেখার মতো মন থাকলে জানালার বাইরে সততঃই দেখা যায় জীবনের জলছবি। জীবনই উৎসব।

আমাদের অতি প্রিয় শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের ‘রাজার অসুখ’ গল্পের ফকিরকর মনে আছে কি? সে গাছতলায় বসে খালি হাসে। এই যে পৃথিবী বনবন করে ঘুরছে, রোদ উঠছে, বৃষ্টি পড়ছে, গাছের পাতা গজাচ্ছে আবার ঝরে যাচ্ছে — এই সবই তার হাসির খোরাক। ফকিরের এই মন আমার আপনার মধ্যেও আছে কিন্তু। খালি সেই মনের জানালাটা আমরা অনেক সময় খুলতে ভুলে যাই। দৈনন্দিন ব্যস্ততার চাপে পড়ে ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণে’-র মহোৎসবে যোগ দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। আসুন, রাখী পূর্ণিমার সৌভ্রাতৃত্ব আর সম্প্রীতির উৎসবের লগ্নে আমরা পরস্পরের কাছে খুলে দিই আমাদের মনের জানালা। দেখাই যাক না কি আছে ওপারে। আর ওপারে যদি আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন দেখুন কি আছে এপারে। যা দেখছেন তা কেমন লাগছে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার অপেক্ষায় থাকব।

সকলে ভাল থাকবেন, আনন্দে থাকবেন আর জীবনের উৎসবে যোগ দিতে ভুলবেন না।

‘মনেরে আজ কহ যে
ভাল মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।’

শুভেচ্ছাসহ

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
২৬ শে আগস্ট, ২০১৫

টেকি স্বর্গে গেলেও

সুজয় দত্ত, Ohio, USA

ছোটবেলায় স্কুলের পরীক্ষায় ‘জীবনে উৎসবের গুরুত্ব’ বা ‘তোমার প্রিয় উৎসব’ গোছের গতানুগতিক রচনা লেখার সময় ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। খেয়াল হল অনেক পরে যে, বাংলায় উৎসবকে ‘উৎসব’ বলার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। কারণ এর আগাগোড়া সবটাই যে ‘উৎ’। দোল-দুর্গাপূজো-দিওয়ালির মতো মেগা-আকর্ষণগুলোতে তো বটেই, আজকাল বিশ্বকর্মা পূজো, রথযাত্রা বা জগদ্ধাত্রী পূজোতেও মোটামুটি একই ছবি। জনগণের তুমুল উৎসাহ-উদ্দীপনা, ছুটি পেয়ে উৎফুল্ল মন, আয়োজক কমিটিগুলোর উত্তুঙ্গ ব্যস্ততা, আনন্দ-উদ্বেল কচিকাঁচাদের উচ্চকিত কোলাহল আর উল্লাস, আচমকা বৃষ্টি এসে সব আনন্দ মাটি করে দেবে কিনা তাই নিয়ে উৎকণ্ঠা, প্রতিমা-আলোকসজ্জা-মন্ডপসজ্জায় সেরার পুরস্কার পেল কারা সে-ব্যাপারে উৎসুক কৌতূহল — এসব তো আছেই। আবার চাঁদা আদায়কারীদের উৎপাত, রাস্তাঘাটে যেখানেসেখানে গজিয়ে ওঠা প্যাভেলের দরুণ উৎকট যানজট, মাইক আর শব্দবাজির অসহ্য উৎপীড়ন, ভাসানের সময় পাড়ার চ্যাংড়া আর মস্তানদের উৎশৃঙ্খল আচরণ — এগুলোও ঘোর বাস্তব। এইরকম দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠার পর পেশাগত কারণে যখন পাশ্চাত্যদেশে পাড়ি দিলাম, সেখানকার প্রবাসী বাঙালীদের উৎসবের ধরনধারণ দেখে ‘কালচার শক’ লাগল দুটো কারণে। প্রথম কারণটা ব্যাকরণগত, অর্থাৎ উপসর্গটা বদলে গিয়ে ‘উৎ’ থেকে ‘সু’ হয়ে যাওয়া। পশ্চিমী দুনিয়ায় বাঙালীদের উৎসব সুপরিকল্পিত আর সুশৃঙ্খল, পরতে-পরতে সুরুচির পরিচয় রেখে তা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। এর ব্যতিক্রম বেশ বিরল। আর দ্বিতীয় কারণটা হল, দৈনন্দিন কর্মজীবনের প্রচণ্ড ব্যস্ততা ও পেশাগত প্রতিযোগিতার তীব্র ইন্দুর-দৌড়ের মধ্যেও সময় বার করে নিয়ে কী অসাধারণ নিষ্ঠা আর ধৈর্যের সঙ্গে তাঁরা একটু একটু করে প্রস্তুতি নেন এই অনুষ্ঠানগুলোর জন্য — তা নিজের চোখে দেখার অভিজ্ঞতা। দেখে শুনে মনে বারবার প্রশ্ন জাগত, কিসের তাগিদে, কোন্ অনুপ্রেরণায় তাঁরা বছরের পর বছর এটা করেন।

ক্রমশঃ বুঝলাম, জন্মভূমির সঙ্গে হাজার হাজার মাইলের ভৌগোলিক দূরত্বের যে রূঢ় বাস্তবতা, তার বিরুদ্ধে এটা আমাদের মানসিক জেহাদ। জীবনের স্রোতে ভেসে জীবিকার প্রয়োজনে দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছি আমরা। বাংলার মুখ দেখেছি, তাই পৃথিবীর আর কারো মুখ দেখতে চাইনা — জীবনানন্দের মতো একথা না বলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে চেয়েছি, ‘অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে? অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে’। কিন্তু জন্মভূমির সঙ্গে নাড়ির টানটা রয়েই গেছে। একটা যত্নলালিত, স্মৃতিবিজড়িত সুখানুভূতির মতো সেই টান আমাদের পেশাগত দায়বদ্ধতার নির্মম যান্ত্রিকতার মধ্যেও সুযোগ পেলেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পাশ্চাত্যদেশের নাগরিক, বাংলা তাদের কাছে নেহাৎই ম্যাপে বা গ্লোবে ভারতীয় উপমহাদেশের একপ্রান্তের এক ভূখন্ড। শৈশবে প্রথম মুখে বুলি ফোটার সময়ে যাও বা একটু বাংলা শেখে, কিভারগাটেন আর প্রিন্স্টন থেকে শুরু হয় তা আস্তে আস্তে মুছে যাওয়ার পালা (অন্ততঃ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে)। কিন্তু আমাদের ঐ নাড়ির টান আর স্মৃতিকাতরতা এটা বারবার ভুলিয়ে দেয় যে বাংলা তাদের মাতৃভূমিও নয় আর সেখানকার ভাষা কাগজেকলমে তাদের ‘মাদার টাং’ হলেও আসলে বিদেশী ভাষাই। তাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা আরোপিত আগ্রহ আর কৌতূহল তাদের মধ্যে সঞ্চার করে দিতে আমরা অনেকেই কমবেশী উদ্যোগী। না হলে কীরকম যেন একটা অসম্পূর্ণতাবোধ বা চাপা অপরাধবোধ জাগে মনে। সুতরাং প্রতিবছর শরৎকালের শিরশিরে হাওয়া গায়ে মেখে ঝরাপাতায় মর্মরধ্বনি তুলে অথবা শীতকালের হাড়কাঁপানো ঠান্ডাকে অগ্রাহ্য করে মুচুমুচে বরফ মাড়িয়ে বিলেত-আমেরিকার বিভিন্ন শহরে-নগরে আমরা বাঙালীরা যে হাজির হই কোনো স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় বা গীর্জার ভাড়া করা অডিটোরিয়ামে কিংবা কমিউনিটি হল-এ আমাদের নানা উৎসব পালনে, এর মূল কারণ তিনটে। একটা অবশ্যই ঐতিহ্যমনস্কতা আর সংস্কৃতিপ্রিয়তা, যা আমাদের সবার মধ্যে

সমানভাবে না থাকলেও মোটের ওপর আছে। আরেকটা হল বহুহাজার মাইল দূরের উৎসবমুখরতার আঁচে নিজেদের সঁকে নিয়ে কয়েকঘন্টা হৈছল্লোড়-আড্ডা-মজলিশ আর সবশেষে রসনাতৃপ্তির দুর্নিবার আকর্ষণ। আর তৃতীয়টা একাধারে পরবর্তী প্রজন্মের মনে তাদের শিকড় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলার অভিলাষ (সে-অনুসন্ধিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী হবেনা জেনেও) এবং আমরা আমাদের ছোটবেলায় এসব দিনগুলোয় যে অনাবিল আনন্দ পেয়েছি তা-থেকে ওদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হতে দেবার একটা আন্তরিক চেষ্টা।

কিন্তু উৎসব জিনিসটা তো শুধু বাঙালীদের একচেটিয়া নয়, সারা পৃথিবীতেই এর সর্বজনীন আবেদন। আসলে সময় যদি হয় বহুতা নদী, তাহলে ক্যালেন্ডারে উৎসবের লালরঙা তারিখগুলো যেন সেই নদীর মধ্যে ইতস্ততঃ জেগে থাকা ছোট ছোট চর। কর্মভারাক্রান্ত, সদাব্যস্ত মানুষ প্রাণপণে তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন আর স্বার্থপূরণের দাঁড় বাইতে বাইতে সময়ের উজানে যখন ওগুলোর একটায় এসে ঠেকে, তখন ক্ষণিকের জন্য হলেও বৈষয়িক ও আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার একঘেয়ে, সীমাবদ্ধ ঐদোপুকুরের বাইরে যে বিশাল সমুদ্রের মতো পৃথিবীটা প্রতিনিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় পায়। তাই বিশ্বের যেকোনো দেশে, যেকোনো সংস্কৃতিতে মানুষের কাছে এই দিনগুলির আকর্ষণ দুর্বীর। তবে বাঙালীর কাছে হয়তো বা একটু বেশীই। ছুটিপ্রিয়, ফাঁকিপ্রিয় বলে পরিচিত বাঙালীর বর্ষপঞ্জিকায় পূজাঅর্চনা-পালপার্বণ মিলিয়ে লাল তারিখের সংখ্যা সত্যিই দেখবার মতো। অবশ্য এর সবকটিই আজকের বিশ্বায়িত বাঙালীর মনে একইরকম অনুরণন তোলে না। যে হাতে-গোনা কয়েকটির আবেদন বাংলার ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালীদের কাছেও সমানভাবে পৌঁছয়, সময়ের ক্রমানুসারে সেই তালিকায় প্রথমেই রয়েছে শুক্লাপঞ্চমীর বাণীবন্দনা। কারণ ওটা আসে ইংরেজী বছরের একেবারে গোড়াতেই। স্কুলকলেজের ফেলে আসা বছরগুলোয় এই বিশেষ দিনটাতে বাসন্তী-পলাশ-টোপাকুল-নারকেলকুল-কদমা-দধিকর্মা মিলে যে মোহময় আবেশ সৃষ্টি করত আজকেরো প্রবাসী অধ্যাপক, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ আর চাকুরীজীবীদের মনে, মাত্র কয়েকঘন্টার জন্য হলেও তাঁরা যেন তা ফিরে পেতে চান তাঁদের কচিকাঁচাদের চোখ দিয়ে। সন্ধ্যাবেলা স্নান-টান করিয়ে পাটভাঙা বাঙালী পোশাকে সাজিয়ে তাদের এনে হাজির করেন বিদ্যার দেবীর

সামনে, চলে অঞ্জলি আর হাতেখড়ির পালা। এতেও নিস্তার নেই বেচারাদের, বিকেলে বা সন্ধ্যায় আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রীতিমতো দেড়-দুমাস রিহাসাল দিতে হয়েছে আধো-আধো গলায় ‘আমাদের তোতো নদী তলে বাঁকে বাঁকে’ বা ‘বিত্তি পলে তাপুর তুপুর নদেয় এলো বান’ শোনানোর জন্য, কিংবা ইংরেজীর গন্ধমাখা অনভ্যস্ত বাংলায় ‘টোমার পূজার ছোলে টোমায় বলে ঠাকি’ গাওয়ার জন্য। সত্যি, এমন ‘উইয়ার্ড’ আর ‘ফানি’ ব্যাপারস্যাপার ওদের বাবা-মাদের, ওরা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায়না। জন্ম থেকেই স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটের বোতাম টিপতে আর ল্যাপটপের কীবোর্ডে ঝড় তুলতে শেখানো হয় যাদের, তারা কিনা হাতেখড়ি দেবে পুরুতমশাইয়ের সামনে কাগজ-পেন্সিলে অ-আ লিখে! আর এ যে বসে আছেন বিদ্যার দেবী হাতে একটা ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে — যেটা না চেলো, না ব্যাঞ্জো, না বেস্গীটার — ঙুর পায়ের কাছে নাকি বইপত্র রাখতে হয় আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। কিন্তু বই তো আজকাল সব আইপ্যাড আর কিন্ডলে। অগত্যা সেগুলোই রাখা থাকে প্রতিমার পাশে, পুরুতমশাইয়ের শান্তির জলের ছিটে লাগার ঝুঁকি নিয়েও। আর অঞ্জলি দেওয়ার ভাষাটা? উঃ, কী খটোমটো রে বাবা! বড়রাও ঠিকঠাক বলতে পারে বা বোঝে বলে তো মনে হয়না। একটু ইংরেজীতে সহজ করে বলা যায়না?

বাবা-মাদের ‘উইয়ার্ড’ আর ‘ফানি’ চূড়ান্ত নমুনা অবশ্য পাওয়া যায় দোলপূর্ণিমার দিন (অথবা তার কাছাকাছি উইকএন্ডে) বসন্ত উৎসবে। একে তো বিলেত-আমেরিকায় তখনো রীতিমতো শীত — বসন্তের নামগন্ধও নেই। এর মধ্যে গায়ে জ্যাকেট চাপিয়ে স্নো-স্টর্ম সামলে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হন যে কাভটা করতে, তারপর আর তাঁদের কোনো নৈতিক অধিকার থাকা উচিত নয় ছেলেমেয়েরা খেলতে গিয়ে নোংরা মেখে বাড়ি ফিরলে বা ছবি আঁকতে গিয়ে রং ছিটিয়ে দেয়াল-মেঝে ময়লা করলে বকুনি দেবার। একে অপরের মাথায়-গালে-কপালে লাল, গোলাপি, হলুদ, সবুজ গুঁড়ো মাখিয়ে আর জামাকাপড়ে বালতি বালতি গোলারং ঢেলে এমন চেহারা করেন তাঁরা, যে সার্কাসের ক্লাউনও হার মেনে যাবে। দ্বিতীয় প্রজন্মের তো আর জানা নেই দ্বাপরযুগে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ আর গোপিনীদের লীলাখেলার কথা, বা সেই উপলক্ষ্যে আধপৃথিবী দূরের একটা দেশের একশো কুড়ি কোটি মানুষের একদিনের জন্য পাগল হয়ে যাওয়ার কথা।

তারা নিজেদের মধ্যে নিন্টেভো আর আইফোন নিয়ে খেলতে খেলতে অবাক হয়ে ভাবে, ক্রিসমাসের ছুটিতে তারা যে স্লোবল্ হোঁড়াছুঁড়ি করে বা স্লো-তে গড়াগড়ি দেয় তার রংটা অন্ততঃ সাদা। আর তাকে শাওয়ারের নীচে আধঘন্টা দাঁড়িয়ে কষ্ট করে ঘষে ঘষে তুলতে হয়না। ফ্রেজি আর কাকে বলে!

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গুটিগুটি পায়ে একদিন বসন্ত আসে প্রবাসে। হঠাৎই খেয়াল হয় জনলা দিয়ে তাকিয়ে পড়শির বাড়িটা আর দেখা যাচ্ছে না। কারণ জনলার ঠিক বাইরেই যে গাছদুটো এতদিন শুকনো ঝাঁটারকাঠি হয়ে ছিল, তারা কচি কচি পাতায় ঝাঁকড়া সবুজ। চারপাশের লোকজনের চেহারা জিম্ বা ডয়েটিং ছাড়াই রাতারাতি রোগা দেখাচ্ছে। কারণ শীত আটকাবার জোঝাজোঝা সব আবার ক্রুসেটের অন্ধকারে নির্বাসিত। বাগানের যে ফুলগাছগুলোকে এতদিন ফুলগাছ বলে কম্পনা করতেও কষ্ট হচ্ছিল, তাদের দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে ছোটবেলার সেই ছড়া — ‘কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভরে’। আর ঘুম ভাঙছে স্লো-মোবিল বা স্লো-ব্লোয়ারের শব্দে নয়, পাখির কলকাকলিতে। এইরকম হাজারো রঙীন পরিবর্তনের ডালি সাজিয়ে বসন্ত আমাদের দিলখুশ করে দেয়। কিন্তু সে তো আর ‘মেন্ কোর্স’ নয়, বড়জোর ‘অ্যাপেটাইজার’। আগে এসে প্রতীক্ষার পারদটা চড়িয়ে দিয়ে যায়, মাথায় আউটডোর বার্বিকিউ পার্টি আর লম্বা লম্বা রোডট্রিপের পোকাটা নড়িয়ে দিয়ে যায়। বলিউডি জলসার এম্ সির মতো যেন চীৎকার করে বলে যায়, ‘লেডিজ্ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আব আপকে সামনে পেশ হ্যায় — সামার — ইয়ানে কি ঋতুপুরুষ গ্রীষ্ম !!’ অবশ্য গ্রীষ্মের হাতে মাইক সঁপে দেওয়ার আগে একটা উৎসব সে উপহার দিয়ে যায় বাঙালীদের। নববর্ষ — পয়লা বৈশাখ। হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব ঘুচে গিয়ে সারা বিশ্বের বাঙালী একাত্ম হয়ে যায় এই বিশেষ দিনটিতে মন-মোচড়ানো স্মৃতিকাতরতায়। সেই চৈত্রের সেল, সেই হালখাতা, সেই মিষ্টি-ক্যালেন্ডার — কবে, কেমন করে যে হারিয়ে গেল জীবন থেকে। ‘তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার’। সুদূর বিলেতের বার্মিংহামে বাবলু বসাক বিবিসি স্পোর্টসে চেলসি আর আর্সেনালের খেলা দেখার ফাঁকে টুক করে ইমেলে বা ফেসবুকে বন্ধুবান্ধবদের ‘শুভা নাভাভারসা’ আর ‘হ্যাপি একলা বৈশাখের’ বার্তা পাঠাতে ভোলেনা। শিকাগোর শিপা শিকদারও শেষ মুহূর্তে ট্যাক্স রিটার্ণ জমা দেওয়ার হুড়োহুড়ি

থেকে সময় ছিনিয়ে নিয়ে রিলায়েন্স গ্লোবাল বা পিংগোর সস্তা রেটে কলকাতা-দিল্লি-মুম্বাইয়ের সব বাঙালী আত্মীয়স্বজনদের ফোনে শুভেচ্ছার পর শুভেচ্ছা জানায়। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এই একবিংশ শতকের প্রবাসী বাঙালী জীবনে বাংলা নববর্ষের তাৎপর্যটা ঠিক কী? আমাদের না আছে চীনাাদের মতো বিদেশের প্রতিটি শহরে ‘বাংলাটাউন’ আর প্রতিটি স্ট্রিপ্ মলে বাঙালী রেস্তোরাঁ, না আছে ইহুদীদের মতো বিশ্বের অধিকাংশ প্রভাবশালী দেশে বিশেষ মর্যাদা বা লবির জোর। তাই এসব জাতির নববর্ষের মতো আমাদের নববর্ষের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বা পরিচিতি বলে কিছু নেই। তার ওপর বিদেশে বাঙালীর জীবন বিশ্বায়নের জাদুকাঠির ছোঁয়ায় অনেক বেশী গতিশীল, দ্রুত পরিবর্তনশীল আর ব্যস্ত। সারা সপ্তাহ সকাল থেকে রাত অবধি পেশাগত দায়দায়িত্বের বোঝা, সপ্তাহান্তে সামাজিকতা রক্ষার দায়, ছেলেমেয়েদের হাজারটা পড়াশোনা-বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ আর বায়নাঝা, কম্পিউটারে বা স্মার্টফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং — এত কিছুর পর পয়লা বৈশাখ নিয়ে আলাদা করে মাতামাতি করার সময় থাকে নাকি? না থাকাটাই স্বাভাবিক, তবু আশ্চর্যজনকভাবে কিছু মানুষের থাকে। তাঁরা হল্ ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন মহড়া দিয়ে প্রচুর খরচপত্র করে মনো’ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খাড়া করেন, হয়তো এক-আধটা সাহিত্যপত্রিকাও বার করেন। কেন করেন? কে তাঁদের মাথার দিবি দিয়েছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে? আসলে এই ‘কেন’র কোনো উত্তর হয়না। হৃদয় কি আর সবসময় অঙ্কের হিসেব মেনে চলে?

যাইহোক, ঋতুপুরুষ গ্রীষ্ম স্টেজে আসা মানেই কিশোর-আশা বা সোনু-শ্রেয়ার মতো পরপর হিট। প্রথমেই রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী। চুটিয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। তারপর মেমোরিয়াল ডে। ক্যাম্পিং, বেড়াতে যাওয়া, দিনভর খেলাধুলো। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী নিয়ে নতুন করে আর কী-ই বা বলার আছে? রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরবর্তী সাড়ে সাত দশকে আর নজরুলের জীবনাবসানের পরবর্তী চার দশকে গঙ্গা আর পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যগগনে বহু নক্ষত্র, আধানক্ষত্র ও স্বঘোষিত নক্ষত্রের উত্থানপতন ঘটেছে এই সময়ে। কিন্তু অনেক বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে, শক্তি-নীরেন্দ্র-প্রেমেন্দ্র, সুনীল-সমরেশ-শীর্ষেন্দু, বনফুল-মৌমাছি-কালো ভ্রমর আর সুবোধ-মল্লিকা-শ্রীজাত পেরিয়ে এসেও প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতি

চর্চার ভরকেন্দ্র এখনো সেই গুঁরা দুজন । গুঁদের নামদুটো পশ্চিমী দুনিয়ার আপামর জনসাধারণের জিভের ডগায় হয়তো থাকেনা, কিন্তু সেখানকার মননশীল, বিশ্বসচেতন, সাহিত্যমনস্ক মানুষের কাছে বাঙালীর সেরা পরিচয়পত্র এবং বঙ্গসংস্কৃতির ঝকঝকে প্রচ্ছদ আজও গুঁরাই (এবং সত্যজিৎ রায়) । তাই বিলেত-আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বাঙালীরা মে মাসে গুঁদের জন্মতিথিতে কোনো অনুষ্ঠান করলে তাতে অবাঙালী আর অভারতীয় মুখও দেখা যায় কিছু কিছু । এইপ্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে । উচ্চশিক্ষার জন্য সদ্য এদেশে পা দেওয়ার পর এখানকার বিভবৈভব, পরিকাঠামো, জীবনযাত্রার মান, কর্মসংস্কৃতি — সবকিছু দেখে তখন বিস্মিত আর চমৎকৃত বললে কম বলা হয় । স্বভাবতঃই ইউনিভার্সিটিতে আমেরিকান সহপাঠীদের সম্বন্ধেও একটা অজানা সমীহ ছিল । না জানি এরা কী হবে ! সারা বিশ্বের সব খবর তো রাখেই, বোধহয় পুঁইশাক চচ্চড়িতে পাঁচফোড়ন না সর্ষেফোড়ন দেয় অথবা ল্যাংড়া বেশী মিষ্টি না হিমসাগর — বাংলার এহেন হাঁড়ির খবরও এদের নখদর্পণে । সেই বিশ্বাসেই ওদের একজনকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, ‘You are familiar with Rabindranath, right ?’ সে খানিক ভেবেটেবে উত্তর দিল, ‘Is it one of those nationwide chains, like Dunkin Donut ?’ সেদিন বেশ হতাশ হয়েছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ ভাবি, ও তো এক অর্থে ঠিকই বলেছিল । এ পরবাসে রবীন্দ্রনাথ তো একটা নেশনওয়াইড চেন বা দেশজোড়া শিকলেরই নাম, যাতে বাঁধা পড়ে আছে বস্টন থেকে সান্ ডিয়েগো, মায়ামি থেকে সীয়াটল — সমগ্র আমেরিকার বাঙালীরা । এ-বাঁধন হৃদয়বেগের আর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার, যাকে ‘পরতে গেলে লাগে’ না, কিন্তু ‘ছিড়তে গেলে বাজে’ ।

এইসব চুকেবুকে গেলে জুন মাসটা কেমন যেন একটু ঝিমিয়ে যায় । ঠিক যেমনটি ঝিমিয়ে যায় অডিয়েন্স, যখন বলিউডি জলসায় সুপারস্টাররা গাইতে গাইতে গলা শুকিয়ে গেলে একটু বিরতি নিয়ে আনকোরা অপরিচিতদের স্টেজে পাঠায় । এই সময়টায় বিরক্তি জমতে জমতে যখন লোকের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে-ভাঙে, একঘেয়েমি জমতে জমতে চোখ প্রায় ঢুলুঢুলু, ঠিক তখনই ধামাকা !! সকলকে জাগিয়ে দিয়ে, চাগিয়ে দিয়ে, হুল্লোড় লাগিয়ে দিয়ে উইংস্ থেকে বেরিয়ে আসে শাহরুখ — না না — মিঠুন — থুড়ি থুড়ি — বঙ্গসম্মেলন! আমেরিকার Cultural Association of Bengal

আয়োজিত বঙ্গসংস্কৃতির এই বাৎসরিক মহাভোজ জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহান্তে স্বাধীনতা দিবসের লম্বা ছুটির ‘গরম ভাতের’ সঙ্গে যেন মুচুমুচে পাপড়, চনমনে ধোকার ডালনা আর জিভে-জল-আনা ভাপা ইলিশের স্বাদবৈচিত্র্য নিয়ে হাজির হয় । যা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে এদেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে ছুটে আসে সংস্কৃতি-ক্ষুধার্ত বাঙালী । তবে বাংলার সংস্কৃতি মানে তো আর শুধুই ধামাকা নয় । আরে বাবা, বাঙালী কিশোর-আশাকে দিয়েও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েছে । তাই প্রবাসে তার সাংস্কৃতিক ‘বুফের’ মেনুতে যে গলা-জ্বালানো ঝালচচ্চড়ির সঙ্গে থাকে স্নিগ্ধ কলাইয়ের ডাল আর কোপ্তাকালিয়ার পাশাপাশি থাকে নিরামিষ ঝোল — এ আর আশ্চর্য কী ? মানে রূপকথাতেও থাকে, আবার সত্যিসত্যিও থাকে । বাংলা ব্যান্ডের সাম্প্রতিকতম জীবনমুখীর পাশাপাশি ধূপদ-অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত, ধুমধাড়াক্ক নাচাগানার পাশাপাশি হেমন্ত-মাল্লা সন্ধ্যা-আরতি, আধুনিক টলিউডি বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি উত্তম-সুচিত্রাকে ফিরে দেখা — ইত্যাদি বৈপরীত্যের বিচিত্র তরঙ্গদোলায় দুলতে দুলতে কোথা দিয়ে যে কেটে যায় তিনটে দিন ।

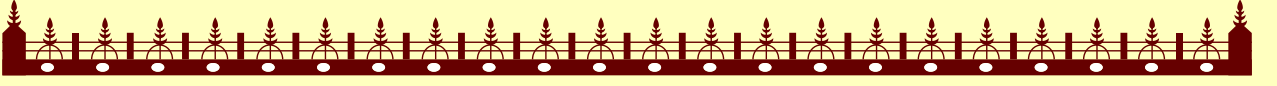
এর মাস-দুয়েকের মধ্যেই চারপাশের প্রকৃতির আবার ভোলবদল, রংবদল । দিন ছোট হয়ে আসছে আস্তে আস্তে । সন্ধ্যার পর একটু গা শিরশির করে, রাতে এসি আর লাগেনা । চারপাশের গাছগাছালিও যেন টানা পাঁচ মাস একঘেয়ে, সবুজ ইউনিফর্ম পরে ক্লান্ত । কোনো এক অদৃশ্য ফ্যাশন্ ডিজাইনার নিঃশব্দে এসে লাল, হলুদ, কমলা, খয়েরী আর সোনালির চোখধাধানো সাজে সাজিয়ে দিয়েছে তাদের । আর তাদের গা থেকে উদাসী হাওয়ায় খসে খসে পড়ছে সেইসব রঙের টুকরো, মাটিতে তৈরী হচ্ছে রঙীন গালচে । বাঙালী অবশ্য সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে দেখে অন্য দৃশ্য । নীল আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া তুলোর মতো মেঘ, দিগন্তবিস্তৃত কাশবনে হাওয়ার হিল্লোল, ভোরে শিউলির গন্ধ, কুমোরটুলিতে শেষলগ্নের ব্যস্ততা, আদি ঢাকেশ্বরী থেকে নিউ মার্কেট অবধি কেনাকাটার ঢল, পাড়ায় পাড়ায় মন্ডপসজ্জার অপূর্ব শিল্পকলা । ভাদ্রশেষে বিশ্বকর্মা পূজোর বিকেলে শেষ ঘুড়িটি আকাশ থেকে মিলিয়ে যাবার পরেই মনের ভিতরে যে উৎসবের ঢাকে কাটি পড়ে যায়, পক্ষকাল ধরে তার হাজারো আয়োজন আর প্রস্তুতির পরিসমাপ্তি অবশেষে যষ্ঠীর দিন বোধনের সকালে আসল ঢাকের সুমধুর শব্দে । কিন্তু এসব তো ঘটছে বহুসহস্র মাইল দূরে । প্রবাসী বাঙালীদের তো আর কাশবন-শিউলি-

কুমোরটুলি বা বাঁশকাপড়ের মন্ডপ নেই, নেই অষ্টমীর রাতে দল বেঁধে ঠাকুর দেখে বেড়ানো বা দশমীর বিকেলে পাড়ায় পাড়ায় বিজয়ার মিষ্টিমুখ। অথচ শারদোৎসবের এই প্রতীকী উপচার-উপকরণগুলির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁদের পূজোর আনন্দের নির্যাসটুকু পেতে অসুবিধা হয়না। কারণটা খুব সোজা। দুর্গোৎসব আসলে বাঙালীদের মনে। আলোকসজ্জা, মন্ডপসজ্জা আর অন্যান্য বাহ্যিক জাঁকজমকের গভী ছাড়িয়ে এটা এমন একটা অতীন্দ্রিয় চেতনার স্তরে পৌঁছে গেছে যে বছরের একটা দিন আকাশে অসময়ের মেঘ বা অকালবর্ষণও কেড়ে নিতে পারেনা মনে শরতের অনুভূতি, বিদেশী শহরের কোনো গীর্জা বা স্কুলের ভাড়া করা মঞ্চও যেন হয়ে ওঠে বারোয়াড়ি সর্বজনীন প্যাভেল, চারিদিকে ওক্-মেপল্-জুনিপারের বরা পাতার পচনশীল স্তূপ থেকেও যেন ভেসে আসে শিউলির সুবাস। এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ওগুলো আমাদের সত্তার সঙ্গে যে বিদেশের মাটিতেও কষ্টকল্পিত মনে হয়না। অবশ্য জনাভূমির স্মৃতিকে সচেতনভাবে উস্কে দিতে বিলেত-আমেরিকার পূজো কমিটিগুলোর চেষ্টার ক্রটি নেই। দেশ থেকে আনানো ঢাকি বা রেকর্ডে ঢাকের বাজনা, ধুনি নাচ, সিঁদুর খেলা, মেনুতে অষ্টমীর নিরামিষ আর নবমীর মাংস-ভাত। কলকাতা আর মুম্বাইয়ের নামী-অনামী শিল্পীদের এইসময় লম্বা বিদেশ সফর (কেউ কেউ তো বঙ্গসম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে এসে পূজো পর্যন্ত থাকেন)। বিদেশের বিভিন্ন শহরের পূজোয় দুদিনের অতিথি হয়ে এসে তাঁরা গান-বাজনা আবৃত্তি-নাটকে মাতিয়ে দিয়ে চলে যান। এবং বছর-বছর আমন্ত্রণ পাওয়ার ইচ্ছেটা জোরগলায় ঘোষণা করে দিয়ে যেতে ভোলেন না। বিজয়ার ‘আসছে বছর আবার হবে’ ধ্বনির সঙ্গে মিলে যায় তাঁদের অন্তরের অভিলাষ। আর একটা জিনিসের উল্লেখ না করলে পূজোর কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পূজোসংখ্যা পত্রিকা। বিদেশে জন্মানো এবং বড় হওয়া আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের পক্ষে এটা বোঝা খুবই দুরূহ যে কীভাবে সর্বাঙ্গে প্রিন্টিং প্রেসের গন্ধমাখা রংবাহারী মলাটের এই বইগুলো যুগের পর যুগ ধরে আসল ঢাকে কাঠি পড়ার বহু আগেই পূজো-মরশুমের উদ্বোধন ঘোষণা করে এসেছে নানা স্বাদের, নানা রসের সাহিত্যসম্ভার নিয়ে। মহালয়ার আগে ঐ বইগুলো হাতে না এলে কেমন একটা ‘কী নেই কী নেই’ ভাব, যেন ফুচকা খেতে গিয়ে বাদ পড়ে গেছে তেঁতুলজল। বিদেশের মাটিতে অবশ্য সাতসকালে ড্রাইভওয়ায়ে ডেলিভারি-বয় ছুঁড়ে

দিয়ে যাচ্ছে পূজোসংখ্যা আনন্দমেলা বা নিউজ কিয়স্কে টাইম ম্যাগাজিন আর ওয়াল্ স্ট্রীট জার্নালের পাশে শোভা পাচ্ছে শারদীয় দেশ — এখনো এসব স্বপ্নের পর্যায়ে। তাই এখানকার বিভিন্ন পূজোকমিটি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায় তাদের নিজস্ব শারদপত্রিকা প্রকাশ করে। তার পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপনেরই আধিক্য, কিন্তু খুঁজলে দু-চারটে মণিমানিক্য যে মেলে না — এমন নয়।

কলকাতায় বারোয়াড়ি পূজোগুলো অনেকেই দশমীর পরেও প্যাভেল খোলেনা পুরোপুরি, ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’ গোছের একটা পরিস্থিতি তৈরী করে রাখে। কারণ দিন পাঁচেক বাদেই যে কোজাগরী পূর্ণিমা। বিদেশেও যে হলের যে মঞ্চে দুর্গাপূজো হয়, সাধারণতঃ সেখানেই তার পরের সপ্তাহান্তে সবাই আবার সমবেত হন লক্ষ্মীপূজোয়। অবশ্য কিছু কিছু শহরে এর আয়োজন হয় ঘরোয়াভাবে, কারোর প্রাসাদোপম বাড়ির বিরাট বৈঠকখানায়। ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো, পাঁচালীপাঠ, সন্ধ্যারতি, লাইনে দাঁড়িয়ে হইহই করে ভোগপ্রসাদ খাওয়া — এসবের পর অনেক জায়গায় স্থানীয় বা বহিরাগত শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। আর ঠাকুমা-দিদিমারা যে বলতেন কোজাগরী পূর্ণিমায় রাত জাগলে পুণ্য, সে তো প্রবাসী বাঙালীদের প্রায় একচেটিয়া। কারণ বঙ্গদেশে যখন লক্ষ্মীপূজোর রাতে পুণ্যাখীদের চোখ ঢুলুঢুলু, বিলেত-আমেরিকায় তখন রীতিমতো সকাল। ঘুমোবার প্রশ্নই নেই। এর পক্ষকাল বাদেই আবার রাতের আকাশ আলকাতরা, চাঁদ উধাও। সেই অমানিশার নিকষ কালো অন্ধকারে সারা বাংলা যখন রংবেরঙের আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত আর হরেকরকম বাজির রোশনাইয়ে মাতোয়ারা, তখন প্রবাসী বাঙালীদের ঘরে ঘরেও জ্বলে ওঠে দীপাবলীর আলো। মানে ব্যাটারী দেওয়া ইলেক্ট্রিক মোমবাতি অথবা এল্ ই ডি আলো। ভূতচতুর্দশীর রাতেও ঐভাবেই জ্বালানো হয় চোদ্দো প্রদীপ। তবে একটাই দুঃখ — যত্রতত্র যেমন খুশী বাজি পোড়ানোটা বেআইনী। নামমাত্র বাজী পোড়াতে গেলেও রীতিমতো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বা পুলিশ প্রশাসনের লিখিত অনুমতি লাগে।

সে লাগুক। জুলাইয়ের গোড়ার দিকে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে বা ইংরেজী নববর্ষের প্রাক্কালে আতসবাজির উৎসবে অংশ নিয়ে বাঙালী সে-অভাব পুষিয়ে নিতে জানে। অক্টোবরের শেষ রাতে ছমছমে হিমেল অন্ধকারে সে আর পাঁচটা আমেরিকানের মতোই ভূত-পেত্নী-দতি-দানার মুখোশ



পরে হ্যালোউইনে মাতে । থ্যাংকস্‌গিভিং-এর সন্ধ্যায় বাঙালী কায়দায় টার্কির কালিয়া বা টার্কিচচ্চড়ি রান্না করে আমেরিকান বন্ধুবান্ধব আর পাড়াপ্রতিবেশীকে খাইয়ে তাক লাগিয়ে দেয় । ক্রিস্‌মাসের সময় বাড়িতে বলমলে ট্রী সাজায়, সকলের সঙ্গে উপহার বিনিময় করে । শুধু নিজের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি

অন্ধের মতো দুহাতে আঁকড়ে ধরে বিচ্ছিন্ন, অন্তর্মুখী, একলষেঁড়ে জীবনযাপন করতে সে মোটেও বিদেশ পাড়ি দেয়নি । পালপার্বণ উৎসব-আনন্দ তার রক্তে । যেখানে যায় সেখানকার উৎসবকেও আপন করে না নিয়ে সে থাকতে পারেনা । সেই যে বলে না, টেকি স্বর্গে গেলেও —





ভীষ্মের উদ্দেশ্য

হোলি

ধীমান চক্রবর্তী, IL, USA

বসন্তকাল, “হোলি হায়” —

বাচ্চা-বুড়ো অংশ নেয়

পূর্ণিমা আজ, দোলের দিন

আজ সকলের মন রঙীন

অশোক, পলাশ গাছের দল

ফুলের নেশায় আজ পাগল

কার কি ধর্ম, কে কোন্ দেশ,

ধনী-গরীব নির্বিশেষ

গলায় গলা মিলিয়ে গাই,

“আজকে আমরা এক সবাই”

বিদ্বেষের আজ হোক ইতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

আজ সকলে খেলছে ফাগ

ভুলে যত দুঃখ-রাগ

উড়ছে হাওয়ায় লাল আবীর

সবুজ, হলুদ, গোলাপী

আরও কত রকম রং

পোশাকেরও অন্য ঢং

ভরিয়ে তুলুক সবার মন

সকলে হোক আপন জন

কেউ-ই কারও শত্রু নয়

“মানুষ” - এটাই পরিচয়

উদার হৃদয় চিরন্তন

সবার জন্য আলিঙ্গন

ফাগুন দিনের উৎসবে

রং মেখে আজ ভূত সবে

আবীর মুখে, রং জামায়

কোনটা যে কে, চেনা-ই দায়

কি যেন ভাই নামটি তোর -

রিক, রহিম, না রামকিশোর ?

মিষ্টি খাইয়ে এ ওকে

বিদায় জানাই দুঃখকে ।

কলিকাতার ঐতিহ্যবাহী চোরবাগান চট্টোপাধ্যায় পরিবারের জগদ্ধাত্রী পূজা

ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ীর আঁকাবাঁকা পথ শেষ, ভোরের কলকাতার জলধোয়া রাস্তাও বিরল — তবু আজও নবউত্তরিত আধুনিক কলকাতা ধরে রেখেছে তার ঐতিহ্য। কল্লোলিনী কলকাতা ধরে রেখেছে তার প্রাণ। চঞ্চলা মহানগরী শান্ত হলে আজও তার নিবুম রাতের রাস্তা বার বার মনে করায় আমরা বহু যুগ, বহু শতক ধরে আধুনিক হতে দেখলাম তিলোত্তমাকে, শুধু বদলায়নি তার আত্মা। যে আত্মার স্পর্শে আজও অমলিন তিলোত্তমা, আজও তার নিশ্চুপ ভোর সূর্যপ্রণাম করে শঙ্খধ্বনিত, আজও দুর্গাপূজায় সেজে ওঠে তিলোত্তমা নববধূ বেশে। তেমনই এর একপ্রান্তে অমলিন আজও কয়েকটি এমন পূজা যার অস্তিত্ব ভাস্বর হয়ে আছে। এমনই এক পূজা হলো চোরবাগান চট্টোপাধ্যায় পরিবারের “রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র ও গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, ব্রিটিশ আমলের অ্যান্ডারসন রাইটসের তৃতীয় প্রজন্মের বেনিয়ান সুশীলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের “ত্রিকালীন জগদ্ধাত্রী পূজা।”

“রামবাবুর আমল থেকেই সংযুক্ত পরিবার। পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুশীলকৃষ্ণ চলে এসেছিলেন মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের ‘রামচন্দ্রভবন’ থেকে চোরবাগান লেনের বাড়ীতে। এই নূতন বাড়ীতেই তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী সরোজসুন্দরী দেবী শুরু করলেন ‘জগদ্ধাত্রী পূজা।’ শাস্ত্রবিচারে শ্রেষ্ঠ শক্তি পূজা কঠিনও বটে। ১৯১৫ সালে প্রথম পূজা হয় সুশীলবাবুর দেওঘরের অধুনা ঝাড়খন্ডের বাগান বাটীতে। আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠলো সমগ্র পরিবার।

কথিত আছে পূজার প্রারম্ভে প্রতিমার ডাকের সাজ হতো। কিন্তু সুশীলবাবু বিলেত থেকে আনা ডাকের সাজ বন্ধ করে প্রচলন করেন বেনারসী, মাটির গহনা সহ প্রকৃত গহনার ব্যবহার। তখন স্বদেশী যুগ। এই সাজ বন্ধের উদ্দেশ্য ছিল সেই স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঘরের ভিত্তি নামিয়ে আনা। দেবীকে সজ্জিত করা হতে থাকে সাধ্যমত অলঙ্কারে। চার হাতে থাকে



রূপার অস্ত্র। এই ভাবেই ষোড়শোপচারে দেবীবরণ হয়ে আসছে আজ নিরানব্বই বছর ধরে।

২০১৪ সালে এই পূজার শতবর্ষ উদ্‌যাপন হয়। পূজার ধারাবাদল করতে পারেনি সময়ের পরিবর্তন। আজও ত্রিকালীন পূজা হয় সব নিয়ম মেনে, শাস্ত্র মতে। আজও ভোগরন্ধনের দায়িত্বে নিযুক্ত কেবল বংশের পুরুষ সদস্যরা। মহিলারা যোগাড়, ব্যবস্থাপনা ও পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পূজা প্রাক সন্ধ্যায় আজও ‘রামচন্দ্রভবন’ থেকে আসেন বংশের কুলদেবতা শ্রীধর জীউ, আর আসেন সরোজসুন্দরী পূজিত রাধারমণ ও রাধারানী। পূজামঞ্চ নামেন মহালক্ষ্মী। পূজা প্রাঙ্গণে ঐদের সাড়ম্বর সহাবস্থান। গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আত্মীয়, ভক্ত, বন্ধুসমাগমে। হোম, কুমারীপূজা, ১০৮ প্রদীপদানে সেজে ওঠে পূজা প্রাঙ্গণ। শান্তির জলের স্পর্শে সব যাতনা ভুলে মানুষ মেতে ওঠেন শাস্ত্র প্রেমের আনন্দে।

শুধু বদলেছে স্থান, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবারের নিবাস পরিবর্তনও বদলাতে পারেনি পূজার একাত্মতা। ১৯৫৮ সাল থেকে ‘সুশীলবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র’ ‘শৈলেন্দ্রকৃষ্ণের

দালানে উঠে আসে এই পূজা। যৌথ পরিবার একত্রিত হয়ে সবাই মেতে উঠতেন দেবী আরাধনায়। আবালবৃদ্ধের অংশ গ্রহণে মাতোয়ারা হয়ে উঠতো মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের বাড়ী। এইভাবে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়ীতে পূজা হবার পর যুগচাহিদার পরিবর্তনে বর্তমানে এই পূজা হয় সুশীলবাবুর জ্যেষ্ঠ পৌত্র, “চিন্তামনি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র জয়দেব চট্টোপাধ্যায়ের সল্টলেকের গৃহ “আভাভিলা”-তে।

বংশের পরম্পরায় এতদিন “অধর চন্দ্র পালের পুত্র তারাপদ পাল এবং তার পরিবারের দক্ষ হাতেই চিন্ময়ী মা ধরা দিতেন মৃন্ময়ী বন্ধনে। বর্তমানে শিল্পী যতীন পালের সৃজনে এখন সেই প্রতিমা নির্মিত হয়। এই প্রতিমাটির দুটি বিশেষ ব্যতিক্রমী বিশেষত্ব আছে। ধ্যানানুযায়ী দেবীর রঙ বালসূর্যসম হলেও, দেবী এখানে অতসী পুষ্পবর্ণা। লেখা চোখের একচালা ঠাকুর বর্তমান কুমোরটুলীতে আজও এই বিরল বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে। আভরণীর বৈশিষ্ট্যগুলিও অনুপম। দেবীর গলায় থাকে মাটির অপরাজিতার মালা ও মাথায় মাটির মুকুট। দ্বিতীয় ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো বাহন সিংহের। পুরাতন বঙ্গদেশে দেবসিংহের প্রচলন ছিল। অর্থাৎ ঘোড়ার মুখে সাদা সিংহ। এমনি সিংহ তৈরী হলেও তা প্রকৃত সিংহের বর্ণের হত না। যা বদলে অসাধ্যসাধন করে দেখান বাংলা আর্টের লুপ্তপ্রায় ধারার অন্যতম প্রধান কারিগর কুমোরটুলির তারাপদ পাল। এলা রঙের ব্যবহারে তৈরী হয় প্রকৃত সিংহের দেহের পাটকেল রঙ, সুপারি খোলার ছোবড়া দিয়ে হয় সিংহের লোম ও কেশর এবং চোখে লাগানো হয় কাঁচের চোখ। এইটিই বঙ্গইতিহাসে প্রথম প্রকৃত সিংহের বর্ণের সৃষ্টি।

ত্রিগুণাত্মিকা দেবীর পূজা হয় তান্ত্রিক মতে। কথিত আছে সরোজসুন্দরী দেবী “সুশীলবাবুর আকস্মিক প্রয়াণে ব্যথিত হয়ে দেবীর মাছ ভোগ বন্ধ করে দেন। সেই থেকে বিধিত হলেও এখানে আর মাছ ভোগ হয় না।

এটি তত্ত্বমতে শক্তিপূজা। বাড়িতে বিবাহিতা কন্যা এলে যেমন তাকে সম্বর্ধনা, আদর করা হয়, সেইভাবেই ষোড়শোপচারে দেবীপূজা বিহিত। এই চিন্তারই ছায়াপাত ঘটে ত্রিকালীণ পূজার শেষ ভাগে কুমারী পূজায়। চতুর্বর্গফল প্রাপ্তি কামনায় এই পূজা। পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা কুমারী রূপে নির্বাচিত হয়। কুমারীকে সাজানো হবে বেনারসী অলঙ্কার ও ফুলের সাজে। দেবী স্বরূপে সজ্জিত করেই পূজা হবে তার।

এখনও পুরানো প্রথা মেনে আজও বাড়ীতে ভিয়েন বসিয়েই তৈরী হয় গজা, পাতুয়া, দরবেশ, জিলাপী। ভোগের

বৈশিষ্ট্য হল পূর্বাহ্নে খিচুড়ি ও পায়েস, মধ্যাহ্নে অন্ন ভোগ পঞ্চ ব্যঞ্জন সহযোগে এবং পায়েস ও মিষ্টান্ন, অপরাহ্নে লুচি, কয়েক প্রকার মিষ্টি, ফল ইত্যাদি এবং পূজার সন্ধ্যায় লুচি ও মিষ্টি, ফল, দই, রাবড়ী ভোগ। দ্বিতীয় দিনে হয় বাসি ভোগ, এখানে অরন্ধনের রীতি নেই। আগের দিনের লুচি, মিষ্টি, দই, ফল, নৈবেদ্য ইত্যাদি। আর থাকে দধিকর্মা।

আগে পূজার সন্ধ্যা মেতে থাকতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। কখনও সারা রাত যাত্রা অথবা নামী সঙ্গীত শিল্পীদের গান-বাজনা আবার কখনও বা বাড়ীর ছোট সদস্যদের নাটকে জমে যেত সন্ধ্যা আসর। এবছরও পূজা প্রাক সন্ধ্যায় শতবর্ষ উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ও ভক্তিজীতির আয়োজন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্নে দেবীর বিসর্জনের পূর্বে চিন্ময়ী দেবীকে মৃন্ময়ী বন্ধন থেকে মুক্ত করার আগে কুলদেবতা শ্রীধর জীউ, রাধারমণ রাধারানী ও মহালক্ষ্মীকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কুলদেবতা ফিরে যান “রামচন্দ্রভবনে”, সঙ্গে যায় ঢাকীর দল।



দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সুশীলবাবুর কুলবধু ও কন্যারা মিলে দেবীবরণ করেন। চারপ্রজন্মে এরসঙ্গে সেই কাজে সামিল। ত্রয়ের সংখ্যা বেজোড়। বরণকারিণী স্নেহাঙ্গ আলিঙ্গনে মায়ের কানে বলেন, “আবার এসো মা”। নাড়ু ও ছাঁচিপান মুখে দিয়ে মাকে বিদায় জানানো হয়। আগে বিসর্জনে যেতেন মা কুলির কাঁধে। দূরত্ববিচারে বর্তমানে যান ব্যবহার করা হয়। এই ভাবেই আজ একশ বছর ধরে যুগ চাহিদায় তালে তাল মিলিয়ে সাবেকি ত্রিকালীন জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পূর্ণ হচ্ছে। আজ পাঁচ প্রজন্ম ধরে ধ্বনিত হচ্ছে সেই সঙ্গীত —

“ভজিতে তোমারে শিখি নাই কভু,
ডাকি শুধু তোমায় মা বলে।”

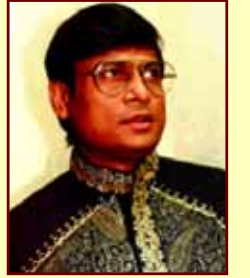
“উৎপলেন্দু চৌধুরীর সাথে আমার আলাপ ‘বাতায়নের’ স্বপ্নকে সফল করার প্রথম প্রচেষ্টার আলোচনার সময়। আন্তরিকভাবে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। কত যে সুন্দর সব ধারণা আমাদের দিয়েছিলেন। অবাক হয়ে উপলব্ধি করে ছিলাম তাঁর জ্ঞান — বিশেষ করে লোকসংগীত ও যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কে। ২০০৮ সালে অনেক স্বপ্ন, অনেক জল্পনা কল্পনার ভাগীদার হয়েছিলাম তাঁর সাথে। সাথে সাথে লিখে পাঠালেন তাঁর গানের উৎসবের কথা। ছবি পাঠালেন, তারপর সব ওলটপালট হয়ে গেল। হারিয়ে গেলেন তিনি। ‘বাতায়নের’ বাইরের জগৎ তাঁর চোখ দিয়ে যা দেখেছিলাম, এতদিন পরে আমাদের প্রথম প্রকাশে তা সকলের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। গুঁর পরিবারে সকলে এখনও সেই tradition চালিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। আশাকরি এসম্পর্কে আরও কথা থাকবে আমাদের পরবর্তী সংখ্যায়।

উৎপলের পাঠানো ‘গানের মেলা’ ও নিজের পাঠানো ছবি দিয়ে শুরু করলাম আমাদের প্রথম ‘বাতায়ন’। উৎসর্গ করলাম আমাদের সশ্রদ্ধ ভালবাসা আমাদের পরম বন্ধুকে “রজনীগন্ধা অগোচরে, যেমন রজনী সপনে ভরে, সৌরভে” — উৎপলের স্বপ্ন ও সৌরভ আমাদের পাথেয় হোক।

অনুশী

গানের মেলা - প্রানের মেলা

বাংলা সংগীত মেলা ২০০৮ [১]



এ বছর ১৪ই এপ্রিল থেকে ২২ শে এপ্রিল অবধি, কলকাতায় সারথরে পালিত হল দ্বাদশ বাংলা সংগীত মেলা। ১৯৯৭ সালে কিছুটা সংশয়, কিছু অনিশ্চয়তা নিয়ে যে সংগীত মেলার সূচনা হয়েছিল, আজ সেই মেলা এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক পঞ্জিকায় এক বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছে। ঠিক বইমেলা’র মতো এই গান মেলা আমাদের সামাজিক জীবনে এক অপরিহার্য অঙ্গকার ও অহংকার হয়ে উঠেছে।

আসলে দ্বাদশবার বাংলা সংগীত মেলা হলেও, এ শহরে, অতীতে, বাংলা গানের মেলা আয়োজিত হয়েছে নানা সময়ে এবং নানা উপলক্ষে। বাংলা গানের স্মৃতি, সত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও আলোড়ন হয়েছে। গানের অনুষ্ঠান হয়েছে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে সপ্তাহ, পক্ষকাল বা কখনও কখনও মাস জুড়েও। পনের বছর আগে বাংলা নতুন শতাব্দীতে পদার্পন কেন্দ্র করে, বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধান যে বিরাট সাংস্কৃতিক আয়োজন হয়েছিল, সেখানেও ছিল গানের অতীত, ও বর্তমানের পরস্পর ধরে অনুষ্ঠান বিন্যাসের এক সুনিপুণ পরিকল্পনা।

অর্থাৎ বীজ ছিল অন্তর্লীন। সেই অন্তর্লীন সত্তাকে লালন করে, পরিচর্যাকে প্রসারিত করে জন্ম নিয়েছিল বাংলা সংগীত মেলা, যার মূল লক্ষ্য - বাংলা গানের সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যের প্রতি দর্শক - শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে উৎস-মূল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিপুল পথ পরিক্রমার গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে অগ্রহাশ্রিত করে তোলা।

এ মেলায়, বাংলা সংগীতের বিভিন্ন কলাকৃতির যে সমারোহ উপস্থাপিত হয়, তা নিয়ে মেলা প্রাঙ্গনে চলে বহু রকমের মত ও পথের অনুসন্ধান। এখানে সহস্রাধিক আমন্ত্রিত শিল্পী গান শোনান ৬টি মঞ্চে। যন্ত্রানুযায়ী অংশ নেন প্রায় শতিনেক সহযোগী যন্ত্রশিল্পী, সংযোজনায় থাকেন দেড়শ জন।

সংগীত শিল্পী, শ্রোতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে, সংগীতের যে বাৎসরিক মিলনমেলা সর্বাসুন্দর হয়ে ওঠে, তার একাধিক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল, বাংলা সংগীতের যে ঐতিহ্য, যে আবেদন, তাকে সাধারণভাবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে তুলে ধরা। এর পাশাপাশি বাংলা সংগীতের বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা। কিছু প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা আমাদের বাংলা সংগীতের উৎপত্তির ইতিহাস।

এই মেলাকে নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে, সরকারি আনুকূল্য ছাড়াও নিজস্ব আয়ের উৎস হিসাবে মেলার একটি ব্যবসায়িক দিক আছে। রবীন্দ্র সদন - নন্দন প্রাঙ্গনে সংগীত সম্পর্কিত বই ও রেকর্ড ক্যাসেটের অর্ধশত স্টলে উপস্থিত হন যাঁরা ক্যাসেট তৈরি করেন, সাউন্ড সিস্টেম ও শব্দ প্রক্ষেপনের যন্ত্র নির্মাণ করেন বা বাদ্য যন্ত্র তৈরি করেন। এ ছাড়াও আসেন বিভিন্ন সংগীত বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশকরা। অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্যোগেই গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে তুলে ধরা হয় বাংলা সংগীতের অনুপম রূপ। এ মেলা তাই একাধারে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠাকামী সকল শিল্পী’র কাছে “প্রানের মেলা”।

আজ, তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা খোলা দরজার বাতাবরণ তৈরি হওয়ার ফলে সারা পৃথিবীর সংস্কৃতি আমাদের চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির উৎস যেটা, সেটা যাতে হারিয়ে না যায় তা দেখা দরকার। এই উৎসের কাছে ফিরে যাওয়া, নিজের উৎসকে চেনা - এটাই সংগীত মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সংগীত মেলার উদ্যোক্তারা বিশ্বাস করেন, কোন সংগীত নিজের ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে বড় হতে পারেনা। তাই বাংলা গানের যে বাদু, যে আকর্ষণী ক্ষমতা তাই তাঁরা তুলে ধরতে চান এই মেলার মাধ্যমে।

মেলা মানেই মিলন আর মিলন মানেই জাতি - ধর্ম - বর্ণ - সম্প্রদায় নির্বিশেষে পারস্পরিক মত বিনিময়ের অবাধ সুযোগ। তাই সমস্ত সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের আদান প্রদানের পথ খোলা রেখে আমরা আহ্বান জানাই বর্হিবিশ্বে সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে এই মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

উৎপলেন্দু চৌধুরী, Kolkata, India

Celebration of Indianness in Minnesota

Debarshi Roy, MN, USA

Minnesota is home to approximately 30-35K Indians. Most of this growing population in this state is residing around the Minneapolis-St. Paul twin city area and in its nearby neighborhoods. With this growing population there is a significant rise in the number of Indian restaurants, grocery stores etc. in this area. We Indians love to preserve and nurture our culture in this foreign land. Minnesota is no exception; every year various cultural and social events are been organized by different Indian associations across the twin city.

Among these different events, the biggest one is **“India Fest”**; which is organized by the Indian Association of Minnesota (IAM) to celebrate the Indian Independence Day. This year this event occurred on 15th August in St Paul Capitol Grounds. This event has been organized by IAM for last 30 years, and in addition this year the Minnesota State Governor has announced that from now on every 15th August will be designated as India Day in the State of Minnesota.

The daylong event attracted approximately 10,000 people. There were different vendors selling delicious Indian food, jewelry, dress materials, home décor items etc. Apart from that there were booths hosted by various non-profit organizations displaying the culture and heritage of India. Long lists of cultural events were conducted throughout this day in a nicely decorated open stage. The audience experienced several great performances by the local talents throughout the day. There were classical music performances, bollywood dances, folk dance forms, classical Indian instrumentals, band performance etc. The two most noted Indian dance groups from Minneapolis area, Katha (North Indian Classical Dance Group specialized in Kathak) and Ragamala (South Indian Dance Group specialized in Bharatanatyam) gave a memorable performance which was highly appreciated by the huge crowd. The narrator was fortunate to perform music in this show as well with his musical team. The event was

concluded with an Indian DJ night which was enjoyed by a huge crowd.

A small town named Rochester (not to be confused with Rochester, NY), which is only 70 miles away from the twin city area has a significant number of Indian population due to the presence of Minnesota's biggest employer, Mayo Clinic. Most of the Indians moved to this small town for their relationship to Mayo. The narrator himself is one of them who moved from Texas.

The Indian population in Rochester also celebrated the Indianness just like India fest. Here the celebration occurred after a week, on August 22nd. It was the first of its kind organized in this little town, so the excitement was much more. This event was named as **Rochester India Day** conducted by the cultural association of bengalees of Rochester or CABERI. It was advertised in the local TV stations and newspapers to attract the local crowd. This show was 4 hour long; many participants from Rochester and the surroundings joined this event. Alike India fest, several music and dance performances were done in India day by the local talents. Additionally, there was a fancy dress show for the kids which made excitement among the kids. Few vendors also joined this show selling handcrafted jewelry, Indian snacks, and henna design. This show has been appreciated and cherished by the locals.



Oregon Travel Experience

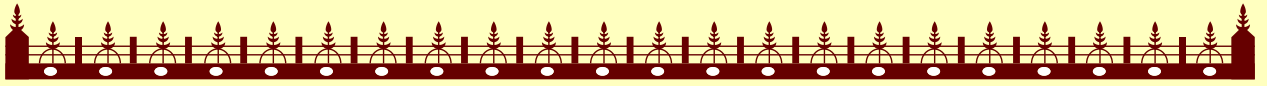
Saumen Chattopadhyay, IL, USA

It was on October 18th last year. The morning of a rainy Saturday. I looked through the window of my hotel room at Cascade Locks, Oregon. Layers of cloud sheltered on the sky the nature was in rainy mood. A glimpse of “The Bridge of the Gods” through dense fog looked mysterious. I didn't want to stay in the cozy hotel room; my mind was treading on the mountains of Oregon. Well, let me get out, I said to myself but no camera, OK? I just remembered I forgot the rain jacket for my camera let alone mine. I stepped out. The Pacific Crest trail was just on the other side, nestled inside a park. With dripping rainwater from my hat and wet jacket I hiked on. It was a steep rocky trail enveloped in mossy and tall pine trees. My footstep seemed to be the only noise breaking the still silence of the forest as it was waking up in twilight. I paid attention to my footstep on the slippery trail with uneven rocks while my senses immersed with the enigma of Pacific Crest trail that spiraled up in the mountain. I heard swift movements of deer and other animals disturbed by the presence of a stranger in their habitat. As the trail twisted at every turn the forest became more dense and impenetrable. Bewildered by the wilderness I started feeling the presence of an intangible being silently watching my movement in his kingdom. It was an uncanny atmosphere where nothingness surrounded all living being the flora and fauna of the forest. I was completely drenched but continued on my voyage with a keen desire to see the unseen.

Then appeared a valley at the end of the forest. I noticed the sign of “Dry Creek Falls” with an arrow pointing toward the beginning of another forest. I remembered the saying “you can't stay one corner of the Forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes”. I marched



on with my curious mind having no fear of moving into unknowns. The trail became more treacherous with steeper slope. I forgot how long I hiked nor I had any desire to check the time on my cellphone. The notion of time appeared to fade away in my mind with a feeling that the “clearest way into the Universe is through forest wilderness”. I didn't want to remember I belong to a civilized world! I lost my soul inside the soul of the forest. And then a sudden noise of footsteps altered my hearing sense. It was an offbeat sound beyond the realm of my expectation. Who could it be? The noise got more



prominent and I was awe-stuck with the sudden appearance of an unearthly masculine figure with bald head running down the trail. I somehow held myself back in the corner to let him pass. He was running at a lightening speed and when I looked back, he disappeared. I tried to hear his fading footsteps, but no vein. When I gained my senses back I looked at the trail behind and it seemed humanly impossible to decent while running without the risk of falling down on the forest floor. Who was he? I asked myself.

I did reach Dry Creek Falls nestled in the

mountain and it was an inexplicable experience. I was perplexed by the sight of the stranger not being able to grasp his supernatural, wind-like decent on a very steep slippery Pacific Crest trail. It baffled me so much. I asked the localites but no one could provide a plausible answer while one said “strange things happen in the deep forests of Oregon mountains”.

The next day was sunny and I climbed up the same trail to take a few shots of Dry Creek Falls. I aspired to meet that “unknown” once again, but he was not present for an unknown reason.

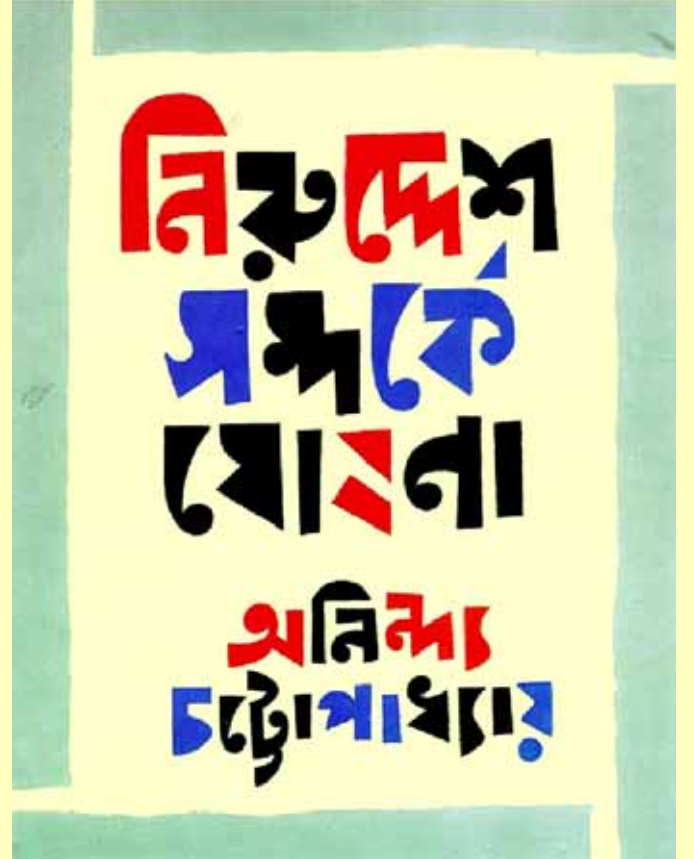
‘নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা’ — অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

মনামী গোস্বামী, IL, USA

বিগত কয়েক বছরে যে সমস্ত লেখা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি অন্যরকম বই লেখক শ্রী অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়-এর “নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা”। বইটির প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০১০-তে। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়-এর পেশা এবং নেশা লেখালেখি। তিনি যেমন বাংলার অন্যতম ব্যন্ড “চন্দ্রবিন্দু”-এর প্রধান গায়ক, তেমনই তিনি সংবাদ প্রতিদিন-এর সাপ্তাহিক ক্রোড় পত্র রবিবার-এর সম্পাদক। এই রবিবার ক্রোড়পত্র-তেই দুই বছর ধরে তিনি যা লিখেছিলেন, তারি কিছু বাছাই করা লেখা নিয়ে সাজানো “নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা”।

বইটিতে রয়েছে মোট ৪৩ টি প্রতিবেদন, যার বিস্তৃতি আমাদের দৈনন্দিন জীবন ছুঁয়ে ডোডো পাখি হয়ে এসপেরান্তো ভাষা পর্যন্ত বিশ্বজনীন। লেখকের মতানুসারে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি লেখা ছাড়া বাকি প্রায় প্রত্যেকটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। ফলে পাঠক একটি মনকেমনকরা রাস্তা — সফরের সঙ্গী হয় লেখাগুলি পড়তে পড়তে। মূলত ৯০ দশকের উত্তর কলকাতা, তৎকালীন কৈশোর বা যৌবনের দিনগুলো এবং সর্বপরি একটা ভীষণ Original (যা বিশ্বায়নের ছোঁয়া থেকে পুরোপুরি বর্জিত) সঁাতসঁোতে মধ্যবিত্ত বঙ্গজীবনের স্বাদ ছড়িয়ে আছে পুরো বইটিতে।

সাল ২০০০-এর ম্যাজিককাঠি ছোঁয়ার আগে ৮০ বা ৯০ দশকের মধ্যবিত্ত বঙ্গজীবনে ছিল বিশেষ কিছু অনুসঙ্গ। যেমন ছিল বিজয়া দশমীর মিষ্টিমুখ ও পাড়ার জলসা, তেমনি ছিল টিনের স্যুটকেশ হাতে নিয়ে স্কুল যাওয়া। ছিল পাড়ার মানবিক মস্তান বাহিনী। আরো ছিল দূরদর্শনে বিন্দু হেলেনদের ভ্যাম্পগিরির বাংলা সিনেমা, চিত্রহার। তৎকালীন বঙ্গজীবন শ্যামল-মান্না-হেমন্ত পার হয়ে রফি-কিশোর-লতা-আশা-সন্ধ্যা কণ্ঠীদের সাথে গলা মিলিয়ে শুনে ফেলেছে সুমন-নচিকেতা। এই সন্ধিক্ষণের টুকরো-টাকরা দিয়েই অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় তৈরী করেছেন মায়াবী এক ছায়াচিত্র। যার মধ্যে



আমরা সন্ধ্যাই নিজেকে কোনো না কোনো ভাবে খুঁজে পাই। পড়তে পড়তে তাই মনে হয়, আরে এ তো আমি-ই। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় এই জাদুকাঠি দিয়েই আমাদের নিয়ে যান ফেলে আসা ছোটোবেলার সেই পৃথিবীতে। যেখানে আজো রয়ে গেছে আধক্ষয়া রবারের টুকরো, কিছু মার্বেলগুলি, ইন্দ্রজাল কমিক্স, হজমি-আঁচার আর হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা। তাই বইটি একান্তভাবেই সেই সময়কার মানুষদের জন্য। যারা 2K পরবর্তী প্রজন্ম, তাদের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক জীবনের জলছবি — যা আজ ডোডা পাখি বা নিয়েনডারথাল মানুষদের মতনই অবলুপ্ত; জীবন থেকে নিরুদ্দেশ।

মেমসাহেবের দিন

দেবীপ্রিয়া রায়, IL, USA

‘ঐ দেখ্ শিগগীরি আয় ! মেমসাহেব যাচ্ছে’ । নীচতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ল্যান্ডিয়ের বড় জানালার কাছ থেকে দিদিভাই উঁচু স্বরে ডাক দিল, সাথে সাথে আমরা দুই বোন পদ্মাবতী চম্পাবতীর সংসার গোছানো ফেলে দে ছুট ! পদ্মাবতী আর চম্পাবতীকে এই সেদিন রথের মেলা থেকে দাদু কিনে দিয়েছেন — ধপধপে সাদা প্লাস্টিকের সুন্দরী পুতুল । তুলি দিয়ে আঁকা ভুরু, লাল টুকটুকে ঠোঁট, কাঁখে আবার কলসী । লাল পাড় শাদা শাড়ি লহর তুলে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে । তাদের দেখা মাত্র আমরা তাদের অসম্ভব ভালবেসেছি । এতদিন ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির জানালার ধারে ভাঙা টিনের ট্রাংকে পাতা আমাদের পুতুলের সংসারে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি দিয়ে তৈরী গিন্নি পুতুল, তার ছোট্ট ছেলে (সেও ন্যাকড়ায় তৈরী) আর তার ন্যাকড়ার বর নিয়ে আমাদের ঘরকন্না চলছিল । তাদের চোখ নাক ছোটপিসি মানে আমার ফুলপি কলম দিয়ে সুন্দর করে ঐকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ন্যাকড়ার ওপর কালি ধ্যাবড়ানো সেই চোখ মুখের সঙ্গে কি এদের তুলনা হয় ? মাস কয়েক আগে সেই গিন্নির বিয়ে হয়েছে পাশের বাড়ির নীচতলায় ভাড়া থাকা ছবির পুতুলের সাথে । খুব মজা হয়েছিল সেদিন । মা আর কাকি খুদে খুদে লুচি আর বেগুন ভাজা করে দিয়েছিলেন, শাঁখ বাজানো হয়েছিল — একেবারে সত্যিকারের বিয়েবাড়ির মত । ছবিটা অবশ্য ভারি অসভ্যতা করেছিল । পুরো একপাতা রাংতার গয়না দেওয়ার জায়গায় সিগারেটের প্যাকেটের চক্চকে রূপোলি কাগজ দিয়ে কাজ চালিয়ে দিয়েছিল । বলে কিনা রাংতা পাওয়া যাচ্ছেনা । অথচ মোড়ের মাথায় গোষ্ঠবতীর দোকানে দু পয়সায় একপাতা রাংতা পাওয়া যাচ্ছে আমরা সেদিন চুলের রিবন কিনতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছি । সেই রাগে দিদিভাই ওর বর পুতুলকে ফেরৎ দেয়নি । এই নিয়ে ইস্কুলে ছবির দলের সাথে এখন আমাদের আড়ি । ওর দলের মাদ্রাজি মেয়েটা বসন্তা নামের, সেদিন আমাকে আর ছোড়দিভাইকে দেখে পিছন ঘুরিয়ে দুই হাতের বুড়ো আঙুলে কাঁচকলা দেখিয়েছে পর্যন্ত । যাই হোক,

আমাদের তিন বোনের বাইরের কারুক্কে দরকার ও নেই । দিদিভাই আর ছোড়দিভাইয়ের বাবা মানে আমাদের বড় পিসেমশাই এগ্রিকালচারাল অফিসার — নানান গ্রামে গঞ্জে বদলি হতে হয়, তাই ওরা আমার দাদুর তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশুনা করে । ওদের সবচেয়ে বড় দিদিও এতদিন এখানেই ছিলেন । সম্প্রতি ডাক্তারি পড়তে হস্টেলে চলে গেছেন । আমাদের থেকে অনেক বড় তিনি আর খুব কড়া মানুষ । তাঁকে আমরা একটু একটু ভয় পেতাম । কিন্তু আমরা তিন বোন হরিহরাআ — দিদিভাই আমাদের দলপতি, আমি আর ছোড়দিভাই ওর ল্যাংবোট । তাছাড়া, আমাদের এই বাড়িতে এত লোকজন থাকে আর এত আত্মীয় স্বজন তাদের ছেলেপুলে নিয়ে দিনরাত্তির আসাযাওয়া করে যে সর্বদাই হৈ চৈ লেগেই আছে । একজন বন্ধুর সাথে আড়ি হল তো বয়েই গেল । লেখাপড়ায় ভাল, হাতের লেখা ভাল, ভাল আবৃত্তি করতে পারে বলে পাড়া প্রতিবেশী দিদিভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । তার খাতিরে আমি আর ছোড়দিভাইও তাই একটু বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াই । তিন বোন একই ইস্কুলে পড়ি আমরা — বাড়ির থেকে হাঁটাপথ কালিধন ইনস্টিটিউশন তারই মর্নিং ক্লাসে যাই । সন্ধ্যা বেলা চারটায় উঠে পড়া মুখস্থ করি দুলে দুলে, হাই তুলতে তুলতে ঘুম চোখে ঠাম্মা আমাদের বিনুনি করে দেন । তার পরে নীল স্কার্ট আর শাদা ব্লাউসে সেজেগুজে ডাকব্যাক লেখা ব্যাগ বুলিয়ে রওনা দিই । ওবাড়ির কালু আর ভুলু দাদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে খবরের কাগজের পাতা উল্টাতে উল্টাতে টেঁচিয়ে বলে, ‘ফুটবল টিম বেরিয়ে পড়েছে’ । একটু রাগ না করে পারা যায়না, তবে কালু দাদা হলো পাড়ার ছেলেদের হীরো, আমাদের থেকে ঢের ঢের বড় তাই কিছু না বলে চুপচাপ পা চালিয়ে যাই । ঝকঝকে রাস্তা তখন গঙ্গাজলের হাইড্রান্ট খুলে ধোয়া হয় । সেসব বাঁচিয়ে যেতে যেতে দিদিভাই বলে, ‘সামনের বছরে তো কমলা গার্লস স্কুলে যাব, তখন আর ওরা কিছু বলবে না । দুপুরের ইস্কুল, সাদার্ন অ্যাভিনিউ থেকে নয় নম্বর বাস ধরে একেবারে শাঁ করে চলে যাব ।’ কিন্তু ঐ নয় নম্বর ধরতে

হলেও তো ইউনিফর্ম পরে ঐ ফুটপাথ দিয়েই হেঁটে যেতে হবে, খালি ইউনিফর্মটা কমলা আর শাদা হয়ে যাবে। কেমন যেন সন্দেহ হয় যে কালু দাদারা দেখলে বোধহয় তখনও ক্ষেপাবে।

আসলে সব দোষটাই বুলগানিন ক্রুশ্চেভ ফকের। তখন অবশ্য বুঝিনি — গত বছর বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভ এলেন কোলকাতায়। ভিড় করে সবাই দেখতে গেলাম আর তার পর যখন তাদের নামে নতুন প্যাটার্নের ফক বেরুলো, তখন দাদু আমাদের তিন বোনকে যষ্ঠীর দিন এক প্যাটার্নের জামা করিয়ে দিলেন। আমরা তো আহ্লাদে আটখানা। হাতকাটা বাসন্তি রঙের জামা আর তার উপর ফিকে নীলে হলুদ পাইপিং দেওয়া আলগা এক গোল বিব, সামনে কেমন বেশ সেই ফিতে দিয়ে বোঁ বাঁধা। কিন্তু ও হরি! আনন্দটা বড় স্বল্পায়ু হলো। জামা পরে বেরুনো মাত্র সামনের বাড়ির দাদারা আমাদের নামকরণ করে ফেল্লেন। এতসব ছোটখাট দুঃখ অবশ্য দুপুর হতে হতে ভুলে যাই। ইস্কুল থেকে ফিরে স্নান করি তিনজনে; ছোট তিনটি বালতি নিয়ে নীচের চৌবাচ্চা থেকে হাপুস্ হাপুস্ জল ঢালি। ওপরের বাথরুমে শাওয়ার টাওয়ার সবই আছে, কিন্তু তাতে আমাদের মন ওঠেনা, কারণ তাতে একে একে স্নান করতে হয়; তিনজনে মিলে একসাথে স্নানের আনন্দ আলাদা। নীচের চৌবাচ্চায় দাদু অনেকসময় ঠান্ডা হওয়ার জন্য ডাবের ছড়া ডুবিয়ে রাখেন। অতিথি সজ্জন এলে আগে তাঁদের সেই ঠান্ডা ডাবের জল দেওয়া হয়। ডাব আসে আমাদের শহরতলীর বাড়ী ঢাকুরিয়া থেকে। সে বাড়ীতে যেতে হলে তখন দুইবার বাস বদল করতে হয় আর তার ও পরে মাঠ ঘাট ভেঙে হাঁটতে হয় বহুক্ষণ। আমার চাকুরে কাকারা সেই বাড়ীতে গিয়ে থাকলে তাঁদের অসুবিধা হয়। তাঁদের অফিস ডালহৌসি পাড়ায়, অতদূর যাতায়াত পোষায় না। আমরা সন্ধ্যাই তাই দক্ষিণ কলকাতার এই নিরিবিলি পাড়াটিতে থাকি। কিন্তু ঢাকুরিয়ার বাড়ি হতে নিত্য পুকুরের মাছ, গাছের ডাব, নারকেল, সুপারি এমন কি পেছনের বাগানে লাগানো কাটোয়ার ডাঁটা পর্যন্ত দাদু নিয়ে আসেন। যেদিন জলে ডাব ভাসেনা, সেদিন, ঠাম্মাকে খোসামোদ করে আমরা তিন বোন চৌবাচ্চায় নেমে পড়ে সাঁতার সাঁতার খেলি। দেবী করলে গুরুজনেরা কেউ বকাবকি করে আমাদের টেনে তুলে একথালায় ভাত খেতে বসান। খাইয়ে দাইয়ে চোখ রাঙিয়ে

আমাদের খাটে শুইয়ে তাঁদের কর্তব্য সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁরা খেয়ে শুয়ে পড়েন। বাড়ী নিঝুম হয়ে আসে - আমরা উসখুস্ করি, পদ্মাবতী চম্পাবতী হাতছানি দেয়। দুপুর বিমঝিম করে এলে তবে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া যায়। দেশলাই বাস্ক জুড়ে জুড়ে তাদের সোফা সেট তৈরী করি বসে বসে, তৈরী করি আলমারি আর টেবিল। পুতুলের সংসারেও রান্না খাওয়ার পাট চোকে, তারা তখন সেজেগুজে বেড়াতে যায় মেনকা সিনেমার সামনের ছোটলেকে, যেখানে আমরাও বিকেল হলে দাদুর সাথে হাঁটতে যাই। ঠিক আমাদের মতন করেই তারা শিরীষ গাছের ফুল ছেঁড়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, হ্যাঙ্গিং ব্রীজে চেপে দোল খায়, লিলিপুলে গিয়ে গোলাপি শাপলার ঝাঁজির ফাঁকে কালো কালো মাছের খেলা দেখে, আর ফেরার সময় ছোট্ট ঠোঙায় করে চীনেবাদাম নিয়ে বাড়ি ফেরে। ফেরার সময় ঠিক আমাদের মত তাদের সাথেও দেখা হয়ে যায় রেল লাইনের ওপারের বুদ্ধ মন্দিরের তিব্বতী লামার। সে নিজের মনে একটা ছোট্ট ঘন্টায় ঘা দিতে দিতে কি এক অজানা মন্ত্র আউড়ে যায়। তার কথা বোঝা যায়না। আমরা তাই ছাতের দড়িতে মেলে দেওয়া একখানা রঙীন শাড়ি টেনে জড়িয়ে সেই তিব্বতী লামা সেজে একটা থালা পেটাই আর মাথা নেড়ে বলি, ‘হঁ-হঁ-হঁ-হঁ’। পদ্মবতীরা কি বোঝে জানিনা, তবে আমাদের মনে বেশ কৃতিত্বের ভাব জাগে।

কিন্তু মেমসাহেব দেখার আনন্দের কাছে এসব আনন্দ ঠুনকো হয়ে দাঁড়ায়। আমি তড়িঘড়ি সিঁড়ি ভাঙি, ছোড়দিভাই আমার আগে যেতে লাল সিমেন্টের রেলিংয়ে উঠে পড়ে সড়াক্ করে পিছলে নেমে যায়। আমি হাঁইমাই করে নেমে গিয়ে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে উকি মারি। সিঁড়ির ল্যাভিঙয়ে মানুষ সমান উঁচু জনলা, কোলে তার বসার তাক। দিদিভাই আগেই সেখানে জায়গা দখল করে বসে আছে। বাড়ীর সামনে ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে কবীর রোড অবধি চোখ চলে - সেই কবীর রোড ধরে মেম চলেছেন। আমাদের এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মেমসাহেব এগিয়ে গেছেন অনেকটা। শুধু রঙীন ছাতাখানা, সোনালী চুল আর স্কার্টের নীচে দুখানা ফর্সা পা - দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু ঐটুকুতেই আমরা একেবারে বিমোহিত। সেদিন আর তারো পরে কয়েক দিন, আমরা কেবল মেমসাহেবের গল্পই করলাম। রেলিং বেয়ে নামতে গিয়ে ছোড়দিভাই যে রেলিংয়ের বাঁকে ঠাম্মার জলকাচা করে



মেলে দেওয়া গামছা নিয়ে নেমে পড়ে অসভ্য চালচলনের জন্য বকা খেল, সেটা গায়েই মাখল না, যদিও এমনিতে একটু জোরে কথা বললেই সে কেঁদেকেটে কুরুক্ষেত্র করে। মেমসাহেব এমনি জিনিষ! সাহেব সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের খুব রাগ, কারণ তারা আমাদের ২৫০ বছর ধরে চাকর করে রেখেছিল। মাত্র সাত বছর হল তাদেরকে তাড়ানো হয়েছে, কিন্তু তার আগে তারা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। ক্ষুদিরাম, সূর্য্য সেন, বাঘা যতীন - এদের গল্প শুনে শুনে সেই বয়সেই আমরা বিপ্লবী। সাহেব দেখলেই ঠ্যাঙাতে রাজী। তাছাড়া পথেঘাটে রিফিউজীর মেলা। আমাদের তো আবার অধিকাংশ আত্মীয় রিফিউজি। সবাই বলে যে দেশভাগটা সাহেবদেরই কীর্তি। সাহেবের সাথে ভাবের কোন প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু মেমের ব্যাপার আলাদা। তারা সাহেব নয়, বরং তারা কেমন পরীর দেশের থেকে নেমে আসার মত রূপ নিয়ে চারদিকে আলো ছড়িয়ে বেড়ায়। যদি মেম আবার এই

পথে আসেন, এই ভেবে কয়েক দিন অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে থেকে থেকে আমরা তিন বোনে পরামর্শ করলাম, বড় হয়ে যে করেই হোক মেমসাহেবদের দেশে গিয়ে তাদের সাথে আলাপ পরিচয় করতে হবে।

তার পরে ৬০ বছর কেটেছে। আমাদের সেই লম্বা জানলা দিয়ে এখন আর কবীর রোড চোখে পড়েনা। মাঝখানে খোলা মাঠ খানিতে গোটা দুয়েক মাল্টিস্টোরিড উঠে আকাশের গায়েও বেড়া টেনে দিয়েছে। আমাদের সেই বাড়িতে কলরবে ভরা বাড়ীটিতে এখন মোটে একজন থাকেন — আমার ছোট কাকীমা। তিনিও বৃদ্ধা হয়ে এলেন। বাকীরা অনেকে পৃথিবীর পাট চুকিয়ে চলে গেছেন। আমরা তিনবোনেই এতদিনে অনেক মেমসাহেব কে চিনে নিয়ে বন্ধুত্ব করে ফেলেছি। কিন্তু সেই পরীর মতন মেমসাহেবকে আজও খুঁজে পাইনি কেউ।



আমাদের বই পাঠে

বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, IL, USA

অনেকদিন ধরে ইচ্ছে ছিল বাংলা বই আলোচনার একটা সভা শুরু করার। কোনো বই বা গল্প পড়ার পরে মনে হয়েছে একটু আলোচনা করতে পারলে ভালো লাগত।

এদেশে প্রায় সব লাইব্রেরিতেই বই আলোচনার সমাবেশ থাকে, অবশ্য ইংরিজিতে শুধু হয়। খুব সাধারণ ব্যাপার।

আমার ইচ্ছেটা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ এল আমাদের বৃহত্তর শিকাগো বাঙালি সমাজের নিজস্ব বাড়ি বঙ্গভবন হওয়ার পরে। একদম সময় পাচ্ছিলাম না। দুগুণা বলে বইপাঠের আসর শুরু করলাম ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে।

অসুবিধে কিছু আছেই। বই পড়ার নেশা থাকলেও এত বই দেশ থেকে কিনে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ, এখানে বুক ক্লাবে পড়ার জন্যে বই আমরা কিনি না, লাইব্রেরি থেকে আনি। বাংলা বই জোগাড় করা সে ভাবে সম্ভব নয়। তাছাড়া একই বই একাধিক পাঠকের (উৎসাহী হলেও) পক্ষে জোগাড় করা তো অসম্ভব।

ভেবেচিন্তে পাঠটা শুরু করা গেল ছোট গল্প দিয়ে। বাংলা ছোটগল্পের সম্ভার খুব বিস্তৃত, যা আমাদের কাছে আছে তা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। উল্লেখ করা উচিত যে আমি বঙ্গভবনের লাইব্রেরি থেকে দুটো গল্প আনতে সক্ষম হয়েছি।

মাসে একবার, রবিবার দুপুরে। বুমুর পালিতকে ধন্যবাদ তারিখ আর সময়ের সুবিধে করে দেবার জন্যে। সাধারণতঃ দুটো নির্ধারিত ছোটগল্প, বিখ্যাত লেখকদের লেখা।

ভাবতে বসলাম কিভাবে পাঠের বিষয়টা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। তারও সুরাহা হয়ে গেল কম্পিউটারের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে আমাদের অতি স্নেহের পাত্রী রঞ্জিতাকে অশেষ ধন্যবাদ — স্ক্যান করা পাতাগুলো সাজিয়ে লিঙ্ক বা

ড্রপবক্সে ভরে পুরো বিএজিসির সদস্যদের কাছে ইমেইল করে পাঠাতে শুরু করা হল। ওর উৎসাহ আর সহায়তাতাই।

না, স্ক্যান করা পৃষ্ঠায় হরফগুলো সুবিধের হয় না — অভিযোগ শুনি। আশা করি সে সমস্যা পরে দূর করা যাবে।

তবে সাহিত্যানুরাগীরা তাতে বইপাঠে আসা বন্ধ করেন না।

গল্প বাছাই করা নিয়েও ভেবে দেখার আছে। রবি ঠাকুর, বনফুল, শরদিন্দু — এঁদের দিয়ে শুরু করা গেল।

তখন থেকে এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি সমরেশ মজুমদার, সতীনাথ ভাদুড়ি, শীর্ষেন্দু প্রচিত, হুমায়ুন আমেদ, নবনীতা, সায়ন্তনী, সত্যজিৎ, সৈয়ত মুজতবা, সুবোধ ঘোষ, মহাশ্বেতা — এঁদের লেখা।

মুখ্য লক্ষ্যটা পড়া গল্প আলোচনা করার জন্যে।

এই অধিবেশন একটা সেমিনার বা সাহিত্য-শিক্ষাকেন্দ্র নয়। আমাদের সাহিত্যপ্রেমী সুরসিক পাঠকরা যা বলেন বেশ গুছিয়ে বলেন, গল্পের বিশ্লেষণে দক্ষতা রাখেন, আর অযথা বা অন্যায্য তর্কে সময় বিশেষ অতিপাত করেন না। এঁরা বই, প্রবন্ধ আর সমালোচনা পড়ায় অভ্যস্ত বলে নেহাৎ অবান্তর আলোচনাতে যান না।

গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের সময়কাল হিশেবে গুছিয়ে বাছাই করা হয় না, কারণ এটা তো বই বা গল্পপাঠের আসর। আমরা সব রকম আধুনিক পুরোনো সব কিছু নিয়ে পড়তে বসতে পারি। সেমিনার নয় বলেই আমাদের তাগিদ আছে নিজেদের চিন্তাধারায় আরো তীক্ষ্ণতা আনার। কোনো বিশেষজ্ঞ এলেই যে আলোচনাটা এমন কিছু বেশি তাত্ত্বিক হবে, তা নাও হতে পারে।

এটা লক্ষণীয় যে আমাদের অধিবেশনে অধিকাংশ যোগদানকারীরা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী ছিলেন না, তবে নানাবিধ

উন্নীত পেশায় আছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বহুল ও যথাযথভাবে যৌক্তিক।

নেহাং অবিনীত শোনাতে কিছু বলার নেই। আমার ধারণা প্রতিটি মানুষ চিন্তা ভাবনার আর বিচারের ক্ষমতা রাখেন। আমাদের এ রকম আলোচনা/বিতর্কে যথেষ্ট গভীরতা থাকে এ কথা নিশ্চিত বলতে পারি। আমরা সকলেই একসঙ্গে বসে শিখি। ইন্টারনেটের কল্যাণে আমরা সকলেই রীসার্চ করতে পারি বলে সাহিত্যের বিষয়ে জটিল কিছু নিজে শিখে নেওয়া শক্ত নয়।

শুরুতে একটা চিন্তা ছিল লোকে আদৌ আসবেন কি না। উদ্যোক্তা হিসেবে জোরসে প্রোমোট করতে শুরু করলাম, লোকের সঙ্গে দেখা হলেই বলতে থাকলাম, এই যে কি খবর — বইপাঠে আসছেন তো — সে কি আপনি জানেন না বুঝি বইপাঠের খবর? আপনি যদি চান আমি আপনাকে আলাদা করে পাঠাতে পারি, না, না, অসুবিধের কি আছে — ইত্যাদি। কন্যাদায়ের মতন অনেকটা (দেখা যাচ্ছে যে বাসন্তীদি লোক দেখলেই বইপাঠ প্রসঙ্গ তোলে)।

না করার কি আছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন থেকে এটা বুঝে গিয়েছি যে প্রজেক্টের কথা নিজে না বললে সে ব্যাপার উহ্য থেকে যাবে।

যষ্ঠীর কৃপায় প্রথম বারে বারোজন উপস্থিত — একেবারে এক ডজন দেখে আমরা পুলকিত।

(এখানে একটা কথা বলা অত্যন্ত দরকার — আমাদের এখানে সাহিত্যপ্রেমিকদের এক উন্মেষ নামক গোষ্ঠী আছে, যা শুরু হয়েছিল কুড়িবছর আগে সুনন্দা বসু, শুভাশিস আর ভাস্বতী লাহার উদ্যোগে আমার বাড়িতেই। সে অধিবেশনের দায়িত্ব নিয়ে সুনন্দা আর অঞ্জলি প্রতি মাসে অধিবেশন করে থাকেন সদস্যদের বাড়িতে — এখানে আমাদের সদস্য লেখকরা তাঁদের স্বরচিত রচনা পাঠ করেন। সকলের লেখা পাঠ সাজ হলে সভা শেষ হয়। এর উদ্দেশ্য অন্য — সকলকে নিজের লেখা পড়ে শোনানোটাই এর প্রধান লক্ষ্য)।

আলোচনাটা কিভাবে হবে? বেশ দরকারি নিয়ম কিছু মানতে হবে যদি সেটা চিন্তাপ্রসারকারী করতে হয়।

প্রথমতঃ, গ্রেট বুক্‌সের আলোচনাতে যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁরা জানেন যে আলোচনার পদ্ধতি বা নিয়ম

আছে। সেটা এই — অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকে বিষয়টা (এক্ষেত্রে গল্পটা) পড়ে আসবেন; আলোচনা সে বিষয়ের মধ্যেই সীমায়িত থাকবে; কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোচনা থাকবে না; সকলেই নিজের মত বা দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। আর উৎসাহী হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় নেবেন না, কারণ সকলের সূচিন্তিত মত শোনা দরকার। মতামত বা বক্তব্য গল্পের তথ্যবাহী হতে হবে, আর দরকার হলে সে বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মতের তফাৎ থাকা আপত্তিকর নয়, যদি তা গল্পের তথ্যভিত্তিক আর যুক্তিগ্রাহ্য হয়, বস্তুতঃ, সকলের মত এক হলে সেটা একঘেয়ে আলোচনায় দাঁড়াতে পারে।

এ সব শুধুমাত্র যাতে এটা গালগল্পো-আড্ডার আসর হয়ে না যায়।

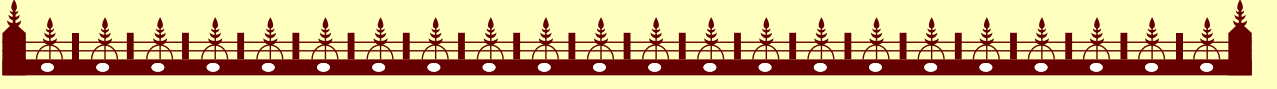
কার্যবিধি যা আমরা মেনে চলি —

নির্দিষ্ট কেউ একজন প্রথমে লেখকের পরিচিতি মিনিট খানেকের মধ্যে বলেন, তারপরে আর একজন বলেন গল্পের সংক্ষিপ্তসার। সেও দুতিন মিনিটে। আলোচনার সময় উপস্থিত প্রত্যেকেই এক মিনিট করে সময় পান নিজেদের বক্তব্য পরিবেশনের। প্রথম বারে বলা হয়ে গেলে আমরা আবার একটা সুযোগ পাই বিশেষ কোনো দিক নিয়ে আলোচনার, সে সময় গল্পের কোন এক অংশ বা চরিত্রবিশেষ উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করার সুযোগ আসে।

প্রসঙ্গতঃ আলোচনার উদাহরণ দিচ্ছি —

সুবোধ ঘোষের ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পের আলোচনাকালে ধনিয়ার চরিত্রের দুটো দিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠেছিল — সে কি সত্যি চরিত্রহীন ছিল, না সমাজের জন্যে হিতকারক দায়িত্ব নেওয়ার পরিচয়ও দিয়েছিল?

বিমল করের ‘জননী’-তে মৃত মায়ের স্মৃতিচারণে সন্তানরা যখন তাঁর পারলৌকিক যাত্রায় পাথেয় সংগ্রহ করছিল, তখন তারা কি মাকে নিজেদের মতন করেই দেখেছিল, ভেবেছিল যে এই গুণগুলো থাকলে মায়ের গমনপথ সহজ হবে, নাকি তারা মায়ের চারিত্রিক গুণাবলীর অভাব বর্ণনায় রত হয়েছিল?



এই বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনা আমাদের মধ্যে হতে পারে বলে আমি সত্যি আনন্দ বোধ করি।

দ্বিতীয় প্রয়োজন ভেবে দেখা ছোট গল্পের বিচারে আলোচ্য গল্প কোন পর্যায়ে পড়ে।

লেখার একটা মানদণ্ড আছে। শুরু থেকে শেষ অবধি সে গল্পে পাঠক এক যাত্রী। শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, আরো নানা রকমে — ঘটনাপ্রবাহে, চরিত্রবর্ণনায়, গল্পের ক্লাইম্যাক্স বা পরিণতিতে পৌঁছোনোয়। আমরা সে সব খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করি। কখনো সে ক্ষেত্রে কিছু সমালোচনাও এসে যায়।

ছোট গল্পের পরিসর স্বল্প। লেখক তাঁর নিজস্ব ক্ষমতায় কোন বা কয়েকটি ঘটনায় চরিত্রদের ফুটিয়ে তালেন। আমরা সে দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। সমালোচনা হিসেবে সেটা সংগঠনমূলক।

মোটামুটি নিয়ন্ত্রক হিসেবে আমি সে সব মতামত লিপিবদ্ধ করি।

গোড়ার দিকে খটকা ছিল যে এ সব নিয়মকানুন থাকলে সবাইকে ঘাবড়ে দেওয়া হবে কিনা। এখন দেখছি যে নিয়ম বস্তুটা যে গণতান্ত্রিক, সেটা সবাই পছন্দই করতে শুরু করেছেন।

মনে হয় আমরা এ রকম একটা পরিবেশের জন্যে তৈরি ছিলাম। বই আমরা সকলে পড়ি অল্পবিস্তর। কিন্তু বাংলা বই এর আলোচনার সমাবেশ?

সে আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কটা পাবেন বা আদৌ পাবেন কিনা কে জানে।

আমাদের এক সদস্য শ্রীঅমলেন্দুর কথায় বলি — আমাদের যাত্রা শুভ হোক।



আমার দেখা রমা দাশগুপ্তা

জয়ন্তী করঞ্জয়, Sydney, Australia

আজকের সুচিত্রা সেনের কথা লিখতে বসে সেই ছেচল্লিশ সাত-চল্লিশের দিন গুলোই বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর সেই দীপ্ত গ্রীবাভঙ্গি নয়ন-লোভন রূপ আর সদর্প পদক্ষেপ যা আমি আর স্কুল ছাড়বার পর কখনোই কারও মধ্যে দেখতে পাইনি।

পাবনা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীতে আমি উনিশশো ছেচল্লিশের জানুয়ারীতে ভর্তি হলাম। তার আগে আমি আমার বাবার কাছে পড়ে প্রতি বছর হাইস্কুলের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে ক্লাসে উঠেছি। কারণ বাবা পাবনা উচ্চ বিদ্যালয়ের (ছেলেদের) প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্কুলে পাঠাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও তিনি নিজে শিক্ষাকতা করেছেন সারাজীবন তবুও নিজের সন্তানদের নিজের হাতে রেখে পড়ানোতে বিশ্বাসী ছিলেন।

যাইহোক সেই যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। আমি যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হলাম তখন সুচিত্রা সেন, আমার রমাদি ওরফে কৃষ্ণা দাশগুপ্তা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, আমার এক ক্লাস উঠুতে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। আরও অনেক মেয়ের মধ্যে এক পলকেই দেখে মুগ্ধ হবার ব্যক্তিত্ব কোটিতে একজনেরই হয়। তাঁর অপূর্ব সুন্দর কণ্ঠস্বর শুধু আমাদের নয় সমস্ত ছাত্রীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। ঐ স্কুলের সময়টুকুর মধ্যে রমাদির ইংরাজী কবিতা আবৃত্তির স্টাইল এবং উচ্চারণের বিশুদ্ধতা দেখে শুনে ঐ বয়েসেই মনে হত যেন কোন মন্ত্রবলে এক বিদেশিনী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তখন ব্রিটিশ আমলের শেষ এবং আমরা সবে স্বাধীনতা পেয়েছি। রেশটা কাটেনি তখনও অনুকরণ প্রিয়তার। কথায় কথায় ইংরাজী বাক্য ব্যবহার করা এবং ওদের ভাষা রপ্ত করবার প্রবণতা থেকে সাধারণ বাঙালী সম্প্রদায় তখনও নিজেদের সরিয়ে আনতে পারেনি। তাই অল্পদিনেই আমরা স্কুলের সব মেয়েরা গুঁর রূপ ও গুণ মুগ্ধ ভক্ত হয়ে গেলাম।

ছোটবেলা থেকেই আমার গানের গলা নাকি খুব সুন্দর ছিল, সকলেই ডেকে নিয়ে গান শুনতো, আর সঙ্গীতানুরাগ



ছিল আমার রক্তে। আমার ঠাকুরদা এবং বাবা পরে দাদারা সকলেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নিয়মিত চর্চা করতেন এবং গানের জগতে তাঁদের অবাধ বিচরণ ছিল। সেই সুবাদে আমিও একটু আধটু যা গাইতাম, তাতেই আমি কৃষ্ণাদির খুব কাছের প্রিয় একজন মানুষ হয়ে গেলাম। কখনও কখনও নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েও আমার গান শুনতেন। গুঁর বোন হেনা আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো, সেই সুবাদে গুঁদের বাড়ীতে যাওয়া আসা ছিল আমার। নিজের ছোটবোনের মতই ভালবাসতেন। যখন তখন ক্লাসের ফাঁক থাকলেই উনি আমাকে গুঁর ক্লাসে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে গান শুনতেন। ছোট থেকে আমি হারমনিয়াম বাজিয়ে গাইতে পারি বলে স্কুলের যে কোনও অনুষ্ঠানে আমার ডাক পড়তো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য অভিনীত হবে, সবার আগে ডাক আসতো কৃষ্ণা আর জয়ন্তীর - একজন গাইবে আর একজন নাচবে। ‘পূজারিনী’, ‘অভিসার’ কত গীতিনাটিকায় যে আমাদের মিলিত নাচগান ছিল, সেদিনের পাবনা গার্লস হাইস্কুল তার সাক্ষী। বড়দিদি অমিয়াদির কড়া আদেশ ছিল আমরা দুজন

ছাড়া কোন উৎসব হবেনা। আজ ভাবি সেই কৃষ্ণাদি-কে আর আজকের মহানায়িকা সুচিত্রা সেন-কে যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান অর্জন করলেন নিজের যোগ্যতায় ও রাজকীয় মর্যাদায়। আমি এক সাধারণ গৃহবধু হয়ে আরও লক্ষ লক্ষ নমুনার একজন হয়ে এখনও বেঁচে আছি। ইচ্ছা থাকে সন্তে পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারলাম না। আসলে কৃষ্ণাদির সঙ্গে আমার তফাৎ — যে তেজ ও গরিমার অধিকারিণী তিনি ছিলেন, আমার মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছিল না। ঐ স্কুলে পড়াকালীনই ওঁর পিসী যিনি আমাদের স্কুলের একজন টিচার ওঁকে নিয়ে গেলেন বোলপুর বিশ্বভারতীতে ভর্তি করবেন বলে। অত রূপ ও গুণের আধার তাঁকে কেন ধরে রাখতে পারবে ঐ ছোট্ট মফস্বল শহর পাবনা। তারপর কিছুদিনের মধ্যে শুনলাম ওর বিয়ে হয়ে গেছে কলকাতার এক বিরাট শিল্পপতির ছেলের সঙ্গে ওখানেই ইতি আমাদের অসমবয়সী কৈশোরের বন্ধুত্বের।

কিন্তু আমি ওকে কখনোই ভুলে যাইনি। খুব মনে পড়ে ওঁর সেই সুরেলা মধুর কণ্ঠস্বর আর যাদুকরা বাচন ভঙ্গী আর ইষৎ বঙ্কিম পদক্ষেপ। দেহ সৌষ্টবে যেন বিদ্যুৎ হিল্লোলিত হত ওঁর প্রতিটি ভঙ্গিমায়ে। একটি ইংরাজী কবিতা আমাদের পাঠ্য ছিল আজ কবির নামটা মনে নেই। তার বিষয় বস্তু ছিল এই যে একজন সূঁচের কাজ করা দর্জির আত্মবিলাপ, অভাবের জন্য তাকে সুচীশিল্প বেছে নিতে হয়েছে কারণ সেই সেলাইটা পরদিন জমা দিয়ে সে যে পারিশ্রমিক পাবে তা দিয়ে সে তার ছেলের মুখে রুটির টুকরো তুলে দিতে পারবে আর ঐ ছোট মুখে হাসি দেখে তার পেট ও মন ভরে যাবে। ঐ কিশোর বয়সে সে কবিতার যথার্থ বোঝার সাধ্য না থাকলেও রমাদির আবৃত্তি অভিব্যক্তি ও ছন্দবৈচিত্র্য কোথায় যে গিয়ে ঘা দিত, কোন মনিকোঠার গোপন তন্ত্রীকে আঘাত করতো তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার নেই। কিন্তু খুব ভাল লাগতো। সবার ওপরে ওঁর অপূর্ব বলবার ভঙ্গি বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এই একজন অন্য দশজনের থেকে অনেক বিশিষ্ট। একেবারে আলাদা।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল, আমরা কলকাতায় চলে এলাম। তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, এসে কালিঘাট দেশবন্ধু স্কুলে দু বছর পড়ে শেষে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলাম। আশুতোষ কলেজে ভর্তি হলাম, ইন্টার মিডিয়েট শেষ করার ছমাসের মধ্যে বিয়ে ঠিক করে মা বিয়ে

দিলেন। ওখানেই হয়ে গেল আমার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতি। আমার দ্বিতীয় জীবন শুরু হল। কোথায় গেল সেই দিনগুলি রমা দাশগুপ্তার সঙ্গে অভিনয়, নাচ গান রাবিন্দ্রিক পরিবেশের বড় হওয়া আর পড়াশুনা। সংসার নামক যন্ত্রের আবর্তে সমান ভাবে ঘুরে চললাম, জীবনের প্রস্তুতিত সুবর্ণক্ষণ বয়ে গেল অবহেলায়। আমার আদর্শ বন্ধু কৃষ্ণাদি পেলো জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান যা আমি তার অসংখ্য গুনমুগ্ধ ভক্তের সাথে দূর থেকে আনন্দে উপভোগ করলাম, কাছে যাওয়ার সুযোগ হোলনা।

আজ এতদিন পরে জীবনের সায়াহ্নে এসে ওঁর মৃত্যু আমার মনে জোর আঘাত দিয়ে গেল, যা প্রিয়জন হারাবার বেদনা। আমি তো এখনও অনেক গান গাই, অন্তরে অন্তরে সুর সাধনা করি নিরন্তর। সুরের একনিষ্ঠ পূজারী আমি। বহুদূর থেকে ভেসে আসা কোন সুর কানের ভেতর দিয়ে অন্তর স্পর্শ করে কোন অদৃশ্য তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে জাগিয়ে তোলে।

কৃষ্ণাদিও তো তেমনই ছিলেন, তিনি যে আমায় কি নজরে দেখেছিলেন তা জানিনা, তবে ঐ দুটো বছরের স্মৃতি যেন আমার অন্তরে গাঁথা রয়ে গেছে। জীবনে এমন ভালবাসা আর কখনও পাইনি। ওঁর অত্যন্ত অনুগত ভক্ত ছিলাম আমি। তাঁকে যেন পূজা করতাম দেবী মনে করে। তখন উঠতি কৈশোর, ভাললাগার কথাটা একটু অন্য স্বাদে ভরা, সেই কবির ভাষায়, ‘আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তোমারে করেছি রচনা’। আজও উত্তম-সুচিত্রার পুরানো সিনেমার দৃশ্য দেখতে বসলে সেই সেদিনের ছবিটাই চোখের ওপর ভেসে ওঠে আর কৃষ্ণাদির সেই আবৃত্তি মুখর চেহারা “stich, stich stich, until the waist is not bent” আবৃত্তির মধুর সুরেলা কণ্ঠস্বর আজও যেন শুনতে পাই, কানে যেন রিম রিম করে বাজে।

যে রাজকীয় সমারোহে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল গোটা ভারতবর্ষ অভিভূত হয়ে দেখলো সে দৃশ্য। কজনের ভাগ্যে এমন পরিণতি ঘটে কবির ভাষায় ‘মরণ রে তুই মম শ্যাম সমান’ তাঁর অবদান সর্বকালে সর্বজনের কাছে চিরন্তন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে আজকের মতো ইতি টানলাম আমার পরম বন্ধু, দার্শনিক এবং পথ প্রদর্শিকা শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের বহুমুখী প্রতিভাময় জীবন দর্শনের।

লিমেरिक

শুভ্র দত্ত, Washington, USA

সৃষ্টির থেকে এ প্রাণপ্রবাহ নারীর কাছেই ঋণী
মা-বোন-বন্ধু-প্রিয়া-চিরসাথী নানারূপে তাকে চিনি
জীবন নদীর স্রোতে প্রতি বাঁকে
সাহচর্যের হাত তার থাকে
নারীদিবস তো একদিন নয়, সে তো প্রত্যেক দিনই ।

ছিল অভিনেতা, হয়ে গেল নেতা, এ তো প্রায়ই দেখি সবে
নেতা থেকে হল অভিনেতা, কেন এমন ঘটে না তবে ?
বাপু হে, তোমার বাকি বহু শেখা
সমাজ ও রাজনীতি রূপরেখা;
নেতা, আসলে তো সে অভিনেতাই, নতুন করে কি হবে ?

দুই প্রতিবেশী দেশে ঘেঁষাঘেঁষি, রেষারেষি চলে খোলাখুলি
ভূমি সীমান্তে পাহাড়প্রান্তে অবিরত চলে গোলাগুলি
দুই দেশবাসী, সুদূর বিদেশে
অবাক কাণ্ড, তারা হেসে হেসে
ছেড়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে মেশামেশি, রেষারেষি ভুলে কোলাকুলি ।



ভাষা দ্বি

A Game of Marbles

Bakul Banerjee, IL, USA

On the tall solid bookshelf
the rusty old can of marbles
sat behind crumbling books
holding nuggets of nostalgia

Flicking figures we drove
marbles into holes in dirt
bartering away the uglies
chipped, dented and dull

We played for wins or losses
saving clean, shiny glass ones
with fancy names - cat's eye
turtles, pearls and oxbloods

Wins or losses, the can grew
heavy and heavier, rattling,
collecting scratches as we took
turns shaking it through our lives.

Later, bearing stones and steelies
we agree - life is rather heavy

Pens, Pencils and Binder Clips

Bakul Banerjee, IL, USA

“Haunted Halloween Happenings” is written
on the orange cup. Once it held candies,
now pencils, but it is the howl unbroken
from my child's throat that I remember the most.

It's hard to build the courage for my mission
of rejecting memories and discard the tankard
with a baseball logo the child has forgotten.
It is full of paintbrushes that meetst her standard.

To complete this chore I need permission
from my aching heart who has to decide
if this dried up silver marker or that broken
pen with the familiar college name must go.

“The Greatest Mom” is the honored definition
that was bestowed on me as stamped on a mug,
now missing a handle. By my true admission,
how can I get rid of this precious diploma?

Papers and paper binders present a condition
of grave dilemma as I peer into old certificates,
reports and ramblings that I kept, but forgotten
or neglected by my children for the time being.



Chicago Poem

Binita Gupta, IL, USA

I heard rumors about her
“Her breath reeks of cigarette smoke”
“Unpredictable and violent”
“She's just like every other girl I've ever met, don't waste your time!”
All of these words leaked around thick cigars
Stuffed between the yellowing teeth of some men I met at a sports bar
But I decided to meet her anyway, in the middle of the night.
She was still awake, the stars in her eyes far from diminished
And while I didn't believe in love at first sight before
In that moment, I did.
She smelled like sunlight and whispered like the wind,
And she was unprecedented, mysterious, and devastatingly brilliant.
I planned to stay for just a night, so the next morning
I slipped on my coat and told her it was lovely getting to know her.
Hearing this, she laughed with her shoulders.
(I remember someone telling me she had hefty shoulders like a man,
But her shoulders looked rather dainty,
Yet somehow I had no doubt they could carry the weight of the world.)
She then simply blew some cigarette smoke out between her red lips,
Leaned in and whispered into my ear,
“Do you *really* think you know me?”
So I paused and asked how long it would take to fully know her
And she laughed again,
That confusing, poetic laugh that sounded like fountains trickling,
Bicycle horns, and feet slamming on pavement, all at once,
And responded coyly
“You'll have to stay with me forever then!”
And so without a second thought
I did.

Binita Gupta is 17 years old and is a twelfth-grader at the Illinois Math and Science Academy in Aurora, Illinois. She intends on majoring in Computer Science in college, and she wants to become a graphic designer, app developer, or web designer one day. Her favorite books are *The Help* by Kathryn Stockett, *The Bell Jar* by Sylvia Plath, and *Amadeus* by Peter Shaffer. In her free time, she likes to paint, bake cakes, play piano and violin, tutor, and read. Her other writings include fictional short stories and other poems. She is currently working on a series of poems about her travel experiences. At school, she is a Community Developer, a Lead Math tutor, a Writing Center tutor, and a facilitator for the school's Ethics program.

Blue Moon

Bani Bhattacharyya, IL, USA

7/30/2015

Hearing the sound of the ringing telephone, I hurriedly answered. It was 10:00 p.m.

"Mom, please watch the moon at 5:00 a.m. tomorrow morning. The blue moon will be closest to the earth at that time," my older son reminded me, calling from Boston.

7/31/2015

If anything unusual, rather lucky or unlucky happens to me today, I can say that it happened "once in a blue moon."

I woke up at 4:00 a.m. this morning. I went to the patio, looked at the beautiful full moon and the innumerable stars in the limitless grayish blue sky. I thanked God to be alive to enjoy the beauty of this vast universe. At my long lived age, and after so many years living here in the USA, I never before took the time to enjoy the beauty like I have today. I was always too busy keeping my mind occupied with worldly distractions.

This early morning is a very special today. It's the morning when I can see large beautiful blue moon appearing closer to the earth. According to NASA Science news, the term 'blue moon' is based on modern folklore, which signifies the second full moon in a calendar, a rare occurrence. Usually there is one full moon in a month. According to NASA the blue moon may not actually be blue; it originates from some particular kind of atmospheric dust. A blue moon occurred in the USA on August 2012, and it will not occur again until 2018.

Because of this beautiful phenomena, I thought of all the people I know and love. I remembered my mother's few words, which she uttered just before she left after visiting me once and she never returned. She stayed with me for just

a month in America when I was very busy working, taking care of my children and husband. I asked her at the airport before she left us, "Dear Mom, how did you like America?"

That was in 1989. She replied, "Everything is nice here and why shouldn't it be? After all, this is a rich country. But, I enjoyed the nice blue sky here the best, and the green grasses."

I took her to see many malls, and many places, including Niagara Falls, while she was here. Surprised, I asked, "Why Mom? Every country shares the sky and the land of green grasses. What's different here?"

My adorable, petite beautiful seventy-two-year old mother replied, "In India, fog and pollution stops me from seeing the beautiful sky reaching infinity or the limitless green grasses. In the crowded city of Calcutta, because of the population density, grasses don't grow. Due to fog and pollution, I never see the beautiful blue sky or the moon and stars."

Since then, every time I see a clear star-studded sky and cool soft green grasses in my backyard, I think of her. Not even a high school graduate, my dear Mom was married at the age of fourteen, but how wise her words were about the world and human life! She truly enjoyed the beauty of nature, God's creation, instead of earthly treasures made and acquired by humans.

Now I think, I've been a fool. For such a long time, I haven't enjoyed that which I can get here for free, for my personal enjoyment and satisfaction. I was too busy with the materialistic world and looked for mental satisfaction in the wrong places. This morning I admired my Mom again and the true beauty in this world.

It reminds me of another saying, "Linger a while, so fair thou art."

Calcutta Cuisine

Balarka Banerjee, Sydney, Australia

There has always been something a bit different in the air in Calcutta. And it's not just diesel fumes. It's something more internal, more in our blood. We Calcuttans have been exposed for a very long time to such diverse ethnic and period influences that we have evolved in a most intriguing fashion indeed. This makes us so frustratingly difficult to define, stereotype or type cast. Unleashed upon the rest of the country, and now the world, we tend to bewilder people by our contradictory, cross pollinated natures which shine through in everything we love and loath. While to us, the mutton loving Brahmin, the dhoti wearing Oxford accented gentleman, and rosogolla downing, pocket watch carrying communist seem like everyday characters they tend surprise people not entirely familiar with us.

They say that the history of food is often the history of a people. Indeed, the eclectic mix of cultures (to be more precise “kalchars”) that is we Calcuttans, is reflected perfectly in the cuisine that we have so lovingly evolved over time. If we look closely, in Calcutta itself you can find culinary influences from Chinese, Tibetan, Thai, Afghan, British, Scottish, Irish, Armenian, Jewish, Burmese, Persian, Pakistani, Italian, French, Swiss and many other ethnicities. Add to this the varied national influences such as Punjabi, Sikkimese, Malayali, Goanese, Maharashtran, Hyderabad, Gujarati and so on and you have an almost unending bouquet of variety. However, the best part about food in Calcutta is that the best of it is often not found in the fancy restaurants, cafes or bistros that one would see and naturally be more familiar with. On the contrary, to truly experience the delights of Calcutta “cuisine” one would have to venture out of their comfort zones. Leave behind their air-conditioning, black tie waiters and ambient

music and head towards dingy holes in the wall, stalls under blue tarp or familiarize one's self with the concept of sitting in a cabin (or to be more precise “kebin”). That is why, fine dining Calcutta style is more than just a meal. It's an expedition. An adventure. A search. And sometimes (not that often) a test of one's courage and gastric tenacity. If you ask a true Calcuttan where one can find the best rolls, or chilli chicken or kochuri they will invariably name same unusual unheard of place and give you a lengthy discourse on why that particular food from that particular place is inarguably the finest in the world. If you ask a second Calcuttan the same question he will give an entirely different answer and spend the next few hours arguing with the first chap. Therefore, it is impossible for my humble self to reach any sort of conclusion as to the “best in West Bengal”. It is equally infeasible for me to cover all of the mentioned culinary varieties that Calcutta has to offer. However, I will most certainly try to present some choice Calcutta cuisine that one might be somewhat less aware of.

One of the great pillars of Calcutta snack food has to be the deceptively simple and absolutely mouth watering “roll”. Traditionally it consists of chicken or mutton kebab wrapped in paratha. On a hot tava, the paratha goes on first and bakes until it is crisp, golden and deliciously flaky. At this point a whipped egg might be poured onto the tava and carefully topped with the paratha. Once it cooks through the egg coated paratha is laid on its back and tender kebab pieces are laid in its bosom and wrapped up snugly. The whole construction tastes delicious and is the perfect one handed snack. Never overstuffed and never under it goes down in minutes and leaves the taste buds begging for more. The history of the roll (or “kati roll”) is somewhat foggy and steeped in mythology. Its first

appearances can be traced back to as early as 1932 in Calcutta. Nizam's is widely credited with the invention of the kati roll as we know it today. Legend has it that on a particularly busy night the restaurant was running out of plates as there was a long string of orders for paratha and kebab. Which is when somebody came up with the ingenious idea of wrapping the two together, thus eliminating the need of plates altogether. Nizam's has always prided itself on serving, the best, the most original and unadulterated rolls in town. In the golden years of 60's and 70's its fame was widespread and it was as much a landmark in central Calcutta as New Market or Globe cinema. A massively built Afghan man used to roam the streets around the cinemas in the evening particularly on the weekends. Known as "pehelwan" he would come up to people as they parked their cars for the evening show and took their orders for kati rolls. Sure enough, he would arrive with them, warm in his hands just before the show would start. "Pehelwan" is long gone now and so has a lot of the charm of Nizam's. Despite several other places where you can get a roll now there is still something special about a Nizam's roll. Sure they may have had to make concessions by selling paneer rolls and downsizing considerably, but the elderly lungi clad mullah who makes them still looks as gruff as ever. He gets snappy if you start asking too many questions about the spices and once snatched away a roll from a friend of mine who requested him for some chilli sauce.

The roll itself has been corrupted gradually over repeated copying and modification. In some places, the filling is not kebabs anymore, and has been substituted by a spicy curry like mess. A number of condiments go in the rolls itself, such as cucumbers, capsicum, tomatoes, chilli sauce, ketchup, and chutneys. "Arsalan" in Park Circus even makes a roll with Cheddar cheese. Not that there is anything wrong with that. I personally adore the double egg chicken roll from Anamika (a road side stall in New Alipore) which is as corrupted as it gets but is the one of juiciest, tastiest rolls you will ever have. Nonetheless there are many of the traditionalists still left and they do a

fantastic job indeed. Some choice ones are "Kusum", "Hot Kati Rolls" (on Park Street, below the Asiatic Society building, you can't miss the aroma when you drive past), Campari, Beduin (Gariahat), Badshah (New Market) and Dhaba (Ballygunge Road). My personal favourite however is a little hole in the wall at the end of Theatre Road (Shakespeare Sarani), opposite the Sahara building. Their mutton rolls are simply addictive.

Old fashioned Mughlai food has been a mainstay of Calcutta for a fairly long time. When the Mughal kings ruled Bengal, the rich aromatic meat dominated cuisine was widely prevalent but perhaps not as popular among the locals. With the conquest of Bengal and the fall of Shiraj-ud-Dullah that type of cuisine diminished quite a bit and was restricted to certain pockets of society only. However, after the failed revolt of 1857 the last Mughal king in Delhi, Bahadur Shah Zafar, was chased out of the capital. He fled to Calcutta with the remnants of his family and staff and was ultimately exiled to Yangoon, where he died soon after. However, most of his staff, servants, and cooks stayed behind in Calcutta. By that time, the people of Calcutta itself had changed into a more versatile, cosmopolitan and open minded breed. It is believed that the highly trained cooks of the food loving Bahadur Shah revived the Mughlai cuisine in Calcutta in the late 19th Century. Many of the older Calcutta restaurants and eateries are said to have been started by them and has shaped Calcutta's love for its unique style of Mughlai cuisine.

The mainstay of Mughlai cuisine is the Biryani. Biryani is fragrant long grained rice, slow cooked with goat meat, potatoes and the key ingredient, saffron among other spices in ghee. It is the very epitome of the sinful decadence of the Mughal empire. Unlike some of the more derivative versions, original Biryani is cooked with a surprisingly few number of ingredients and almost always with goat meat. The Calcutta biryani, is satisfyingly similar to its more authentic

Lucknow or Agra counterparts and is absolutely delicious. People have gone to war over which Biryani in the city rules supreme so that is not a controversy I want to get into. However, it suffices to say that most of the best biriyani can be found at the crossing of Park Street and AJC Bose road. Rahmania, Lucknow and Shiraz are located right there. As a matter of fact, that is the start to something a “biryani strip” in the city which stretches up to Park Circus. Next time you are there, try it with some “chicken chaap” and definitely ask for some of the digestive yoghurt-mint drink to wash it down.

On the subject of Mughlai, one must mention the Bengali equivalent of “comfort food”, Moglai paratha. The origins of this delicacy is quite vague but it sounds like another brilliant kati roll like deviation. This is basically minced meat and whipped egg stuffed into flaky white bread. Served with a salad of red onions. It is fairly tricky to make so a good moglai paratha is hard to come by, but one place that has mastered this delicacy is Anadi Cabin on Jawaharlal Nehru road (just two clicks from Esplanade). Their absolutely divine preparation ensures that you will almost never be able to find a seat there upon arrival. If you haven't eaten at Anadi Cabin you have missed out on a Calcutta institution no less significant than the Victoria Memorial. While there, try the pudding. Trust me, it's not what you would expect.

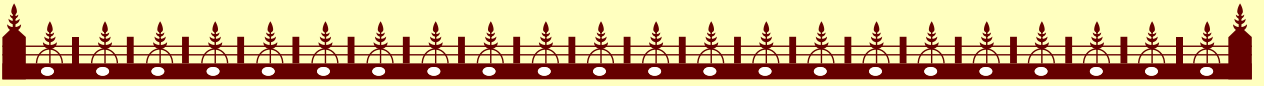
Let's move on to something a bit more international namely British. The “chop cutlet” culture of Calcutta is somewhat unique. Definitely a delicious Raj hangover. But don't expect the rather mild and insipid meat preparation of the UK. The chop cutlets of Calcutta have been changed so greatly that it has been completely emancipated from its heritage. With delectable results. These are rich, fiery, spicy and complicated affairs. Apart from the usual mutton, chicken and prawn you also get some unusual ones. Such as the kabiraji cutlet, a chicken cutlet with a whipped egg coating that gives it a furry golden look and a delicious crunchy texture. This too is a rare delicacy. There are several imposters and copy cats around, the genuine article

is hard to find. One of the best kabiraji cutlets I have tasted comes from a restaurant on M.G. road called “Dilkhusha”. Last time I was there, they claimed to be the originator of the dish. Although details are specky they believe it was created for the British palate in the early 1900's. The name had always mystified me as “kabiraji” in Bengali refers to herbal medication. I could not make the connection between cutlet and herbal drugs except for the fact that overindulgence of the former would definitely require the latter. But I was told by the owner of Dilkhusha (mira-di, if I recall correctly) that the original name was coverage cutlet (referring to the egg white coating) which devolved into kabiraji in the local dialect. As a matter of fact, it was called “fowl kabiraji cutlet” on their menu for many many years and that too was replaced by “chicken kabiraji”.

As far as meat cutlets go, I must mention “afghani cutlet” at the college street coffee house. I will refrain from discussing the coffee house itself, because volumes can be written about its tradition, heritage and ambience. Little is usually discussed about its food or drink. Perhaps rightly so because I personally believe their coffee tastes like flavoured rain water. Nonetheless, the afghani cutlet must be mentioned. It's a mutton cutlet the size of one's palm but cooked with some unusual spice combination and most notable, raisins, currants and nuts. Overall it has a sweet and salty flavor, which is quite unique and is served with a slightly runny gravy which soaks up nicely in some bread.

If the presi/CU crowd claims dominion over the mutton afghani, the Jadavapur gang brandish their “dhoper chop” in reply. Milonda's canteen came up with the treat (whose name in colloquial Bengali translates to “rubbish”). It's half a boiled egg and half an ambiguous (but tasty) filling, coated in breadcrumbs and fried. May not sound like much but it does taste delectable.

Instead of mutton and chicken if you prefer fish then you must try the fish fry and possibly the fish roll. The fish fry is traditionally seasoned bhetki coated in breadcrumbs and deepfried. The



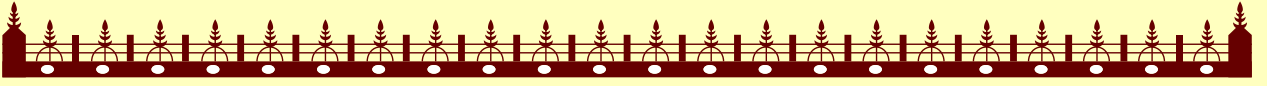
fish roll is more creative. It's a bhetki fillet rolled around a stuffing made out of another pureed and seasoned fish flesh (usually carp). Also coated in breadcrumbs and deep fried. Both of these are hard to find in their nascent forms. Cheaper copies tend to be heavy on seasoning and lean on fish. The undoubted leader for both is "Bijoligrill", originally located near Bijoli cinema in Bhowanipore. They are also a premium caterer for marriages and other social functions so next time you are in Calcutta try to get yourself invited to an upmarket wedding.

Tibetan food has caught on off late in Calcutta and is the newest addition to the Calcutta snack cuisine smorgasboard. Momo's are Tibetan dumplings made off a garlicky meat stuffing, best enjoyed with a hot chilli sauce and a light spring-onion soup called thupka. A few Tibetan families had started the trend decades ago when they used to make these momo's in their own kitchen and sell packets of them well informed foodies out of their living room. One of the better known of these families lived on Elgin road. As the elderly family moved on, the place was converted into a restaurant which soon became a series of restaurants. The better known of these is Momo Plaza which is located of street now known as Suburban Hospital Road. The décor is shoddy (almost scary), the tables and chairs are weak but the food is to die for. They serve momo's and a lot of them. There is the classic steamed ones or the tastier fried ones and then a lot of evolved ones culminating in the "pan-fried chilli momo's" which is only for the brave of heart.

Chinese food in Calcutta has also been a long tradition. It is now so well assimilated into Bengali food habits now that it is sometimes impossible to think of it as foreign. As a matter of fact, Indian style Chinese food is now widely accepted as a style unique and singular like Singaporean or Malaysian Chinese. It all started, from a group of Chinese immigrants, predominantly from the Hakka and Cantonese provinces, who settled in a part of Calcutta known as Tiretta Bazaar. Even today that

is where you go for the real thing. There is a Chinese street market at Tiretta bazaar on Bentinck Street. It sets up at around 5:30 am and is sold out by seven. It is not strange or surprising for Calcuttans to stay up all night, clubbing, driving or simply sitting around indulging in adda. When the night seems to inexplicably disappear and your friends start feeling hungry, it's time to hit Tiretta Bazaar. Street vendors mostly sell homemade traditional Chinese food. There are light soothing broths with fish ball or chicken feet. There are heavier schezuan broths which can lift the top of your head right off but works great against a hangover. Then there are steamed buns, dumplings and spicy sausages. The smells and sounds are intoxicating and its seediness as its charm and somehow only in Calcutta does it not seem unusual to be starting a Sunday morning like this.

For more authentic Chinese food one must always venture to Tangra. That is no secret at all. Although there are quite a few more mainstream restaurants there now, there are still a few old fashioned ones, which we always seek out. When you go to those, the cook-cum-waiter takes your order. He brings you some beers and you are expected to take your time with them as he goes around back to catch a chicken for your chilli chicken. It's plucked, skinned and cooked right in front of you. Just be careful when you order "one chilli chicken please" as it can actually be an entire chicken cooked for you. Like almost every type of food, Chinese in Calcutta has evolved and changed, adapting itself to the local palate and ingredients. Now, there is a Chinese restaurant on every corner and road side stalls will toss up chow-mein, chilli chicken and fried rice alongside egg-rolls. If you can put aside puritan tastes then you might just indulge in and enjoy some of the local Chinese. I for one love my "hakka chowmein" with its strong pepper seasoning. Chinese food in Calcutta has developed its own language. "Hakka chow" means dry noodles whereas "gravy chow" is cornflour thickened gravy poured over boiled noodles. "Chilli" refers to a dry dish with a thick soy based gravy with finely chopped green chillies.



“Manchurian” usually refers to meat or veggies fried in a coating and dipped in a hot and sweet sauce. So next time you are in Kolkata, give the big boys like Mainland China, or Chinoiserie a pass and try out the Manchurian chicken and sweet corn soup at your dimly lit neighbourhood joint. You might just like it.

The repressive humidity of Calcutta usually takes its toll on people and staying hydrated is very important indeed. Which brings us to beverages. These days with surfeit of Coffee houses it is difficult to see beyond the 50 rupee mochas, cocoas, lattes or the smoothies, slushies and crushies. I have never been a big fan of these establishments and despite their fancy décor the coffee usually still tastes like dishwater. The places are good for teenagers on first dates but if you want a real drink to pick you up, you should try the tea at Balwant's. This pre-independence dhaba on Harish Mukherjee Road (opposite the gurudwara) serves over a thousand portions of Punjabi milk tea a day. Their secret (although probably not the real one) is that they never expose the tea to direct heat. Leaves in a pouch are immersed in boiling water. Once infused, milk is added and the whole thing is placed in a water bath. Regardless of the procedure, the final product is pure elixir. However, if you fancy a more sophisticated tea drinking experience, you must try Dolly's tea house in Dakshinapan. Started by India's first woman tea taster this place has a relaxed, typically Calcutta feel. The tea itself is unique. Not only can you get some cup of the regular stuff you can experiment with fruit blends,

ginger ale and lemonade punch, mango tea, grapefruit tea and even one with soda and a dollop of ice-cream. Nonetheless, one of the most refreshing and unique drinks I have ever tasted is “daaber shorbot” at “Paradise” behind college square. The place has been there forever and they make a number of soda or milk shake type drinks. “Daaber shorbot” is an unique blend though made from coconut water mixed with possibly some mint, dash of lime and other things which makes it one of the most refreshing drinks I have ever had.

So there we have it. A small sampling of the vast and complicated variety of flavours and aromas that is Calcutta cuisine. The list is by no means complete or comprehensive. I have made absolutely no mention of Putiram's telebhaja, Ujjala chanachur, the alurdom off Viviekananda park, the phuchkas at Maidan, kosha mangsho from Golbari, phulkopir singhara, mochar chop from Aponjon, dahi vada, mishti doi, rosogolla, or notun gurer shondesh. Alas, they must be saved for another time.

However, the lesson here my friends is that the best food in Calcutta is never where you would expect to find it. Just as most things Bengali, nothing is as it seems. The dingiest, darkest, dirtiest corners of this mad city hide the most mind expanding food you will ever taste. Deep fried in tradition, seasoned with mythology and garnished by a dash of bewildering charm, the food of Calcutta is more than hunger quencher. It's an experience.



রান্নাঘরে বিশ্বায়ন — ভোজ কয় যাহারে

রান্না এবং খাওয়া যে কোন সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশ। খাদ্যরসিক হিসেবে বাঙালীর খ্যাতি আছে। অভিবাসী বাঙালী বিদেশের মাটিতেও তার খাদ্যাভ্যাস ধরে রেখেছে। দেশকালের তফাতে রান্নার পদ্ধতি বা উপকরণে সংযোজিত হয়েছে কিছু নতুন আঙ্গিক। কিন্তু বজায় আছে মূল স্বাদটি। আর সেটাই অভিবাসীদের রান্নাঘরের বৈশিষ্ট্য। মা ঠাকুমার মুড়িঘন্ট, মোচার চপ বা ফুলকপির সিঙাড়া আজও তৈরী হচ্ছে অভিবাসী বাঙালীর রান্নাঘরে রন্ধনপ্রণালী অল্পস্বল্প অদলবদল করে। তবে ‘বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচি লাউ’ — বাংলা আর বাঙালী রান্নায় যোগ নিবিড়। অভিবাসী এক বাঙালী, অন্ত্রের রান্নাঘর থেকে কিছু রেসিপি এবার আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম আমরা। আপনারাও নিয়ে আসুন আপনাদের পছন্দের রেসিপি — নানা দেশের, বা একই দেশের নানা অঞ্চলের, ভাগ করে নিন আমাদের সঙ্গে। রসনার পরিতৃপ্তি না হলে জীবনটাই যেন বিশ্বাদ হয়ে ওঠে। ঠিক কিনা?

Recipe

Annyasha Mukherjee Roy, Minnesota, USA



LAU CHAPRA GHONTO

Ingredients: Grated Lau or green gourd-1pc, Methi (fenugreek) seeds, Kalonji or black cumin seeds, Red dry chillies-3, bay leaves, two handful of yellow split chana daal soaked overnight until it get swollen, salt according to taste, baking powder (optional), turmeric powder, ginger paste, Asofoetida or hing, sugar, red chilli powder, mustard oil or canola oil, ghee.

Procedure of Making Chanakabab:

Drain the water from chana daal and then paste the daal in grinder. Pour the daal paste in a vessel and then add a pinch of hing, turmeric powder, green chilli cut into pieces, baking powder, red chilli powder, salt and sugar according to taste, and lastly add Luke warm oil and then mix it well. Form a shape of flat kabab and then deep fry it.

Procedure of Making Sabji:

Add oil to a kadai and once the oil is heated, then add methi seeds, kalanji, red dry chilli, and bay leaves. Then add grated lau in that, stir it well for 5 minutes and then cover it with lid. After 5 minutes take off the lid and add salt, sugar, red chilli powder and green chilli, stir for 7 minutes. Then put the lid on and cook for 15 minutes. Open the lid after 15 minutes and then smash the chanakababs with hand mix in the curry and cook another 2-3 minutes. Add ghee and ginger paste cook for another 2-3 minutes. To be served with rice.

Total time required is 30 minutes.

SOYA CROQUETTE

Ingredients: Soya bean keema, bread, cheese slice, egg (optional), cornflour, bread crumbs, onion finely chopped, soyasauce, garlic chopped, ginger chopped and a bit of paste, bell pepper, red chilli powder, green chillies finely chopped, Maggie hot and sweet sauce, sriracha sauce, chilli sauce (optional), salt, white oil, ghee.

Soya could be boiled and then make chunks by grinding it.

Soya keema chilly: Add white oil in kadai, once the oil is heated add onion slices, chopped garlic, ginger and bell pepper. Fry until onion becomes slightly brown. Prepare a mixture of soya sauce, hot and sweet sauce, sriracha sauce, chilli sauce, salt, red chilli powder and water. Then add this mixture to the kadai and cook for 5 minutes. Then add the soya chunks, cook it and then keep it aside.

Preparing the batter- take 2 eggs, cornflour according to the amount, and water and mix it. This is the batter for the croquette.

Croquette- Breads are soaked a bit with water and then removed the brown part of it. Then roll the cooked soya chunks with bread and take a slice of cheese, roll it and deep fry in batter and then cover with bread crumbs, and then deep fry in canola oil mixed with ghee. This is served hot with sauce.

COCONUT PATTIES

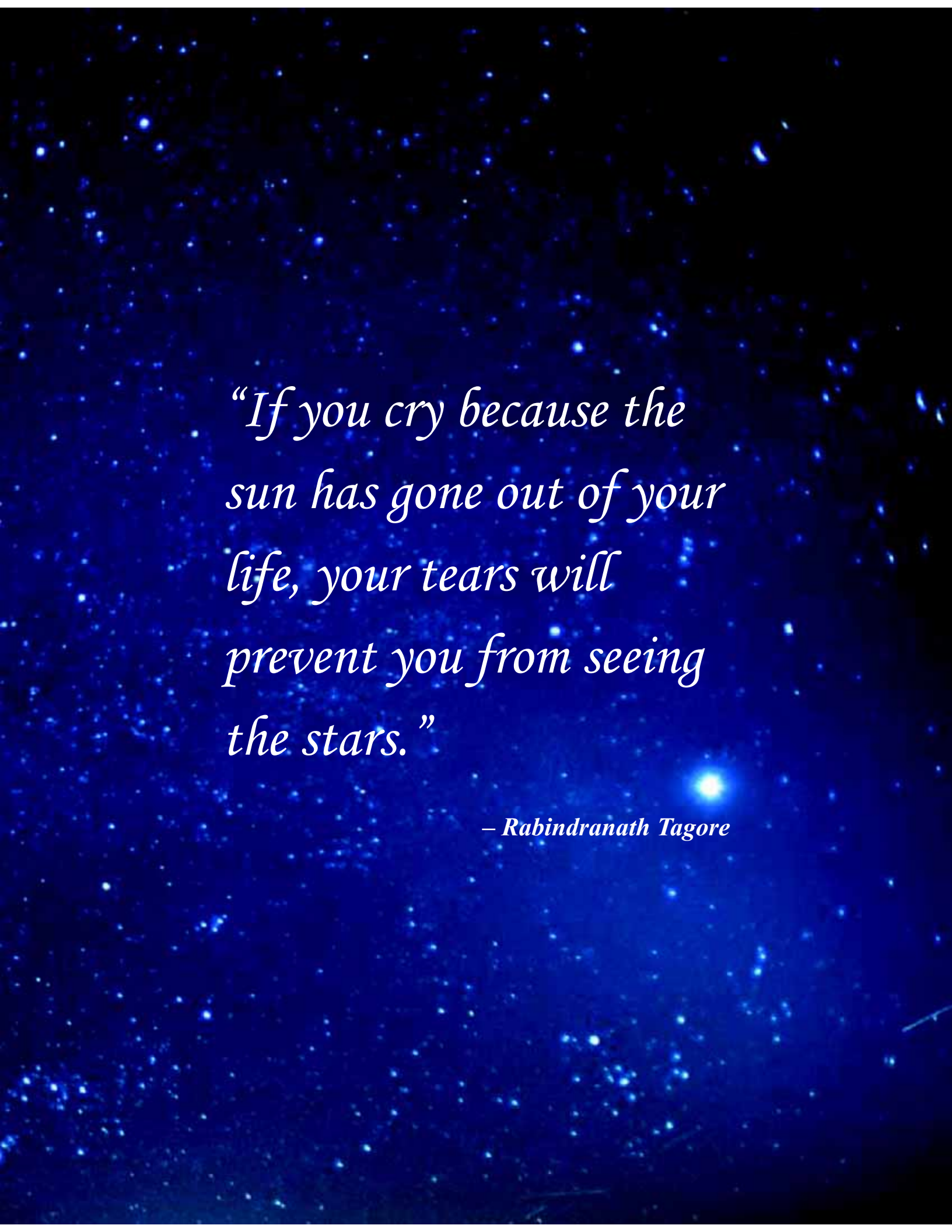
Ingredients: Grated coconut, onion finely chopped, white flour or maida, ghee, canola oil, luke arm water, salt.

Preparation: To make the dough take maida, add a pinch of salt, ghee, a bit of oil and water and then make a dough. Then form the shape of poori or kachori using the dough and then add grated coconut, chopped onion and chopped chilly to cover all sides of the poori (like Mughlai paratha) and then deep fry in mixed oil and ghee. Serve hot with sauce.

CHEESE PARATHA

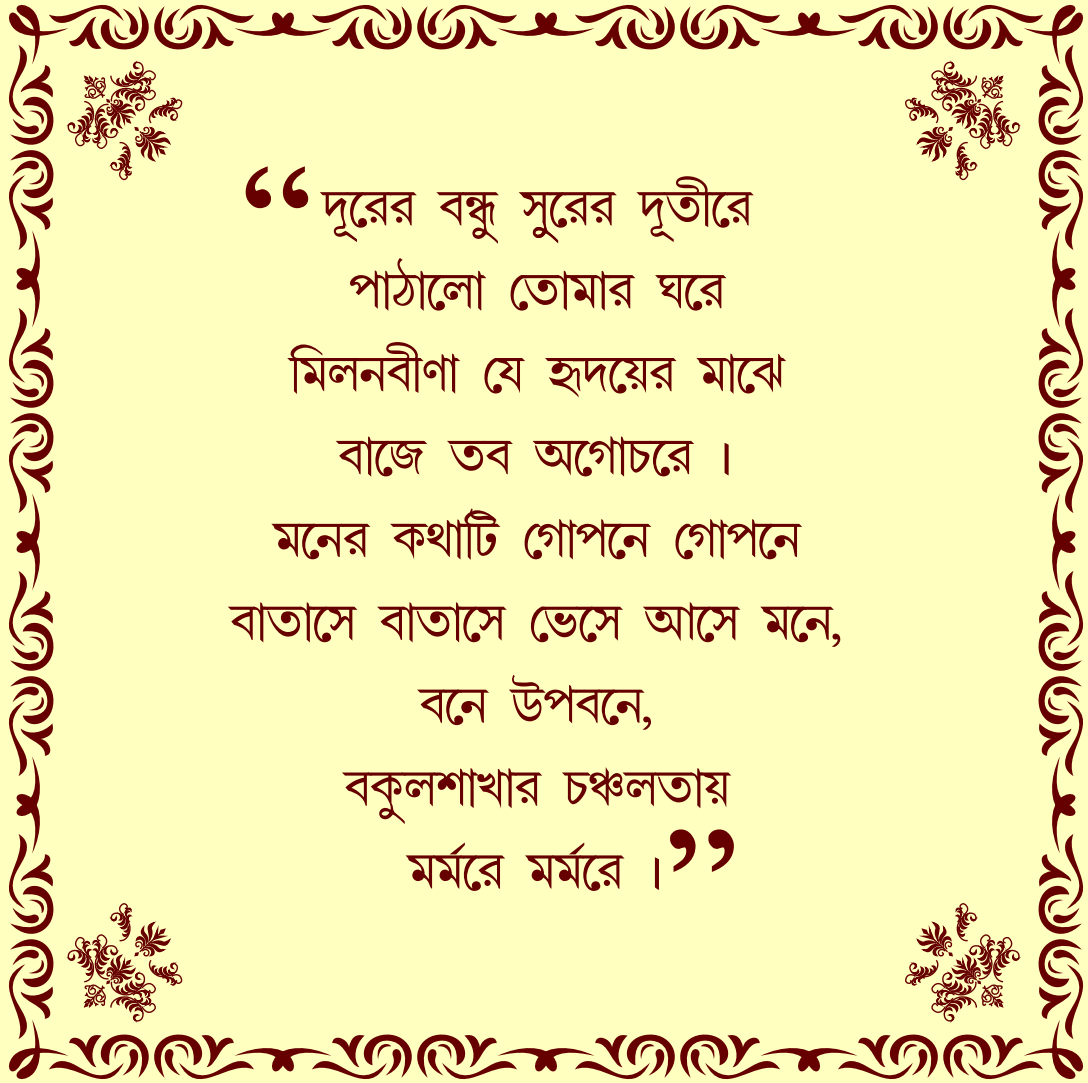
Ingredients: Grated cheese, chaat masala, saharich (white pepper), amchur powder (optional), maida, butter, luke warm water, salt, finely chopped onion and finely chopped green chillies.

Preparation: At first, make a dough of maida with salt, butter, lukewarm water and then make a shape of a round ball from dough. Now mix chaat masala, grated cheese, amchur powder, saharich, chopped onion, chopped green chilli, and make a shape of paratha; add a bit of maida powder and then deep fry in oil. Serve hot with daam aloo.



*“If you cry because the
sun has gone out of your
life, your tears will
prevent you from seeing
the stars.”*

– Rabindranath Tagore



“দূরের বন্ধু সূরের দূতীরে
পাঠালো তোমার ঘরে
মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে
বাজে তব অগোচরে ।
মনের কথাটি গোপনে গোপনে
বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে,
বনে উপবনে,
বকুলশাখার চঞ্চলতায়
মর্মরে মর্মরে ।”